বিশ্ব-প্রতিভা সিরিজ

সমুদ্রজয়ী কলম্বাস

যাত্নকর মার্কনী, দ্বাদশ সূর্য্য, এব্রাহাম লিঙ্কন-প্রণেতা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

অগ্রহায়ণ—১৩৫১

দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

দাম—এক টাকা

দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে
এস. সি. মজুমদার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত

সূচীপত্র

সমুদ্রজয়ী কলম্বাস

সাগরের ডাক

জেনোয়া শহরে সমুদ্রের ধারে,—আজ নয়, কাল নয়,—আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে, একদিন বিকেল বেলায় তিনটী ছেলে আর একটী মেয়ে, অবাক হয়ে চেয়ে ছিল। তীরে ছোট-বড় নানান ধরণের নৌকো এসে জমা হয়েছে—শিশুরা অবাক হয়ে তাই দেখছে।

রোজ বিকেল বেলা তারা বাড়ী ছেড়ে সেই সমুদ্রের ধারে ছুটে আসে, সেই নৌকো দেখবার জন্যে। শাদা-শাদা পালগুলো বাতাসে দুলতে থাকে, সেই সঙ্গে দোলে শিশুদের মন,—কোথা থেকে এরা আসে, আর কোথায় বা যায় তারা চলে! আজ যাদের আসতে দেখলো, কাল এসে দেখে তারা নেই, চলে গিয়েছে···কোথায় গেল তারা?

সেই শিশুদের মধ্যে একটী ছেলের কৌতূহল সকলের চেয়ে বেশী। নৌকোগুলো যেন তাকে আকর্ষণ করে!

নৌকোগুলো যখন অগাধ নীল জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, ছেলেটীর মনও সেই সঙ্গে-সঙ্গে চলে যায়! চলে-যাওয়া নৌকোর দিকে এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে,—সে চেয়ে থাকে, যতক্ষণ না দিক্‌চক্ররেখার আড়ালে একটা ছোট্ট পাখীর মতন হয়ে, নৌকোগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়!

ক্রমশঃ তার কৌতূহল এত বেড়ে উঠতে লাগলো যে, সে গায়ে পড়ে সেই সব নৌকোর নাবিকদের সঙ্গে ভাব করতো; জানতে চাইতো—কোথা থেকে তারা আসে, কোথায় তারা যায়? সমুদ্রের ওপারে কি আছে···শুধুই কি জল, আর জল? এ জলের কি শেষ নেই? ওপারে কি কোন দেশ নেই?

নাবিকরা গল্প করে, সমুদ্রের মধ্যে নানান্ দেশের কথা, নানান্ বিচিত্র দেশ, বিচিত্র সেখানকার লোক, বিচিত্র তাদের আচার-ব্যবহার! ছেলেটী অবাক হয়ে শোনে··· সর্ব্বদেহ দিয়ে শোনে···শুনতে-শুনতে তার মনে হয়, এই সাগরের ওপার থেকে কে যেন তাকে ডাকছে!

এই কৌতূহলী ছেলেটীর নাম কলম্বাস, আর তার সঙ্গীরা হলো তার ভাই-বোন—তারা তিন ভাই আর এক বোন্।

ইতালীর বিখ্যাত বন্দর জেনোয়া শহরে এক ঘর

তাঁতি বাস করতো। সেই তাঁতির এই তিন ছেলে আর এক মেয়ে। তিন ভাইএর নাম হলো, যথাক্রমে ক্রিষ্টফার কলম্বাস, বার্থোলমিউ এবং দিরিগো। সেদিন জেনোয়া শহরের সেই সামান্য তাঁতি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, তাঁর ঘরে এমন এক ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে—যে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে যাবে, এই পৃথিবীর আধখানার সঙ্গে অপর আধখানার পরিচয় করিয়ে দিয়ে, বর্ত্তমান সভ্যতার প্রকৃত প্রসারের সহায়তা করে যাবে।

তাঁতির ছেলে তাঁতি হবে, এই হলো চিরাচরিত বিধান। সেই তাঁতির ছেলের লেখাপড়া শেখার বিশেষ কোন উদ্যোগ কলম্বাসের বাড়ীতে ছিল না। তবে হিসেবটা রাখা, নামটা সই করা, এগুলো দরকার—তাই কলম্বাসের বাবা ছেলেকে তাঁতশালায় ঢোকাবার আগে, কিছুদিনের জন্যে পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দিলেন।

পাঠশালায় কিছুদিন পড়বার পর, সকলেই দেখলো যে, ছেলেটীর অসাধারণ গুণ। হাতের লেখা এত সুন্দর যে, দেখলে মনে হয় না যে, ছোট ছেলের লেখা। পাড়া-পড়সীরা কলম্বাসের বাবার কাছে এসে বলে, তোমার ছেলে যদি বই নকল করে দিন চালায়, তাহলে দেখবে, সে বড়লোক হয়ে যাবে।

সে সময় হাতের লেখা নকল করার কাজের খুব চাহিদা ছিল। শুধু হাতের লেখা বলে নয়, অঙ্ক এবং ছবি আঁকাতেও কলম্বাস সব ছেলেকে ছাড়িয়ে গেল। সে সময় যারা বেশী লেখাপড়া শিখতে চাইতো, তাদের ল্যাটিন ভাষা পড়তে হতো; কারণ সে সময় য়ুরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যা কিছু ভাল বই, তা ল্যাটিন ভাষাতেই লেখা হতো। কলম্বাস সে অল্প বয়সে ল্যাটিন ভাষা এত তাড়াতাড়ি এবং এত ভাল রকম শিখে ফেল্লেন যে বুড়োরাও অবাক হয়ে গেল।

ছেলেবেলায় জেনোয়ার বন্দরে জাহাজগুলোর আসা-যাওয়া দেখতে-দেখতে কলম্বাসের মনে দুরন্ত বাসনা হয়েছিল যে তিনি নাবিক হবেন, অমনি নাবিকদের মত দূর অজানা সমুদ্রে ঘুরে-ঘুরে বেড়াবেন। ভাল নাবিক হতে হলে, ভূগোল জানা চাই, আকাশের নক্ষত্রের বিষয়ও ভাল করে জানা চাই; কারণ, তখনও পর্য্যন্ত আকাশের তারা দেখে নাবিকেরা দিক্‌হীন সমুদ্রের মধ্যে দিক্ নির্ণয় করতো। তাই ছেলেবেলা থেকে নিজের চেষ্টায় তিনি ভূগোল এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিখতে লাগলেন। কিন্তু বই পড়েই তো নাবিক হওয়া যায় না। জলে না নামলে যেমন সাঁতার-কাটা শেখা যায় না, তেমনি জলে

নেমে নৌকোয় না ভাসলে নাবিক হওয়া যায় না। স্কুলে পড়বার সময় যখনই সুবিধা-সুযোগ এসে জুটতো, কলম্বাস নৌকোয় চড়ে পাড়ি দিতেন। সে সব নৌকো অবশ্য বেশীদূর যেতো না, উপকূল ধরে-ধরেই চলতো।

তা ছাড়া তখন সমুদ্র-যাত্রার পথ এত ব্যাপক ও দীর্ঘও ছিল না। শুধু পালের ওপর ভরসা করে জাহাজ বা নৌকো সমুদ্রের ভেতরে বেশী দূরে যেতে সাহস করতো না। তখন য়ুরোপের লোকের কাছে, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকা অজানা ছিল। আধখানা পৃথিবীর সঙ্গে বাকি আধখানার পরিচয় ছিল না। য়ুরোপের নাবিকেরা সমুদ্রের তীর ধরে-ধরে য়ুরোপের সমুদ্রের ধারের বন্দরে যাতায়াত করতো। যে সময়ের কথা আমরা বলছি, সে সময় য়ুরোপে পর্তুগীজরা খুব বড় নাবিকের জাত ছিল। তাদেরই মধ্যে দুঃসাহসী সব নাবিকেরা ছিল, যারা সমুদ্রের দূরপথে বাণিজ্যের জন্যে যাতায়াত করতো।

এই দূরপথের সীমানা ছিল, উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম আফ্রিকার খানিকটা অংশ। দক্ষিণ আফ্রিকার অস্তিত্বই তখন তারা জানতো না। এই দূর-পথে যে-সব দুঃসাহসিক নাবিকেরা আসতো, তাদের মধ্যে অধিকাংশই

আর ফিরতো না। সেই জন্যে সাধারণ নাবিকেরা আর বেশীদূর অগ্রসর হতেও সাহস করতো না।

কিন্তু ভূগোল চর্চ্চা করে তখন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একদল বলতে আরম্ভ করেছিলেন যে, পৃথিবী হলো গোলাকার। আগেকার লোকের ধারণা ছিল যে, আমাদের পৃথিবী হলো এক টুক্‌রো বড় কাগজের মত সমতল। কিন্তু ক্রমশঃ লোকের ধারণা বদলাতে লাগলো। বৈজ্ঞানিকেরা একটার পর একটা প্রমাণ খুঁজে পেতে লাগলেন। তাঁরা বুঝালেন যে আমাদের পৃথিবীটা হলো একটা বলের মত গোল জিনিস! পৃথিবী যদি বলের মত গোলাকারই হয়, তাহলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর যে-জায়গা থেকে যাত্রা করা যাবে, আবার যাত্রাশেষে সেইখানেই ফিরে আসা সম্ভব! বৈজ্ঞানিকেরা কাগজে কলমে অঙ্ক কষে বল্লেন, নিশ্চয়ই সম্ভব! কিন্তু কে তা কাজে প্রমাণ করে দেখাবে? এই কাল্পনিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে কে জীবন বিসর্জ্জন দিতে যাবে?

সেই সময়ে য়ুরোপের লোকের ধারণা ছিল যে, তাদের কাছ থেকে সব চেয়ে দূরের দেশ হলো, এশিয়া। তাদের ধারণা ছিল যে, য়ুরোপের তীর থেকে পশ্চিমমুখো হয়ে কেউ যদি আটলান্টিক সমুদ্র ধরে যাত্রা করে, তাহলে

নিশ্চয়ই এশিয়ায় এসে পৌঁছবে। কারণ তখন তারা জানতো না যে, য়ুরোপ আর এশিয়ার মাঝখানে আমেরিকা বলে আর একটা মহাদেশ আছে। নানা বৈজ্ঞানিকদের লেখা থেকে লোকে এটা তখন স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে সমুদ্র-পথে এশিয়া আছে। কিন্তু আটলান্টিক সাগর পার হয়ে কে যাবে?

যুগ-যুগান্ত ধরে এই আটলান্টিক মহাসাগরের ভেতরের দিকটাকে মানুষ এক বিরাট ভয়ের চোখে দেখে এসেছে। আর তার এই ভয় অহেতুক নয়। পৃথিবীর উপকূল ছাড়িয়ে যারাই এই সমুদ্রের ভেতরে বেশীদূর যেতে সাহস করেছে, তারাই তাদের মৃত্যু দিয়ে জগতে প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছে, এই মহাসাগরের ভেতরে আছে মৃত্যুর রহস্য-লোক, ঝড়-তুফান—জলদৈত্য আর ভয়ঙ্কর সব জল-জন্তুর রাজত্ব। সেখানকার অজানা জলরাজ্য হলো ঝড়ের জন্মভূমি, তুফানের খেলাঘর! সেখানকার বাতাসে—মৃত্যু-নীল জলে আছে, ভয়ঙ্কর সব জলজন্তু, যাদের নিঃশ্বাসে সেখানকার বাতাস বিষাক্ত হয়ে আছে, যারা হাঁ করলে এক-একটা আস্ত জাহাজ মানুষ-শুদ্ধ গিলে খেয়ে ফেলতে পারে।

কোন-কোন নাবিক নাকি অনেক দূর থেকে সেই

ভয়ঙ্কর জলজন্তুর শুধু একটু পুচ্ছ-আলোড়ন দেখে ফিরে এসেছে, কেউ-কেউ নাকি ঝড়ের দিনের মেঘচুম্বী তরঙ্গ-শীর্ষে দেখেছে নামহীন সেই রহস্য-লোকের অধিবাসীদের অস্তিত্বের অস্পষ্ট ইঙ্গিত !

এই ভাবে সমুদ্র-পথ থেকে আগত নাবিকদের কাহিনী থেকে, লোকের মুখে-মুখে, যুগ-যুগ ধরে, মানুষ এই মহাসাগরের অন্তর্দেশকে জেনে এসেছে, তরল মৃত্যুর রহস্য-লোক রূপে···যেখানে মানুষ তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে যেতে পারে না, গেলেও যেখান থেকে ফিরে আসবার আর তার কোনও সম্ভাবনা নেই !

আবার কোন-কোন দুঃসাহসী নাবিক ভেবেছেন, যদি পৃথিবী গোল না হয়,···যদি এই কাগজের মত সমতল আর চ্যাপ্‌টা হয় !···তাহলে তো নিশ্চয়ই বেশী দূর গেলে, কোথায় শেষ সীমানায় এসে পড়তে হবে···সেখান থেকে হয়ত জাহাজ পড়ে যাবে কোন্ অতলে !···

কলম্বাস যখন সমুদ্রের নীল জলের দিকে চেয়ে-চেয়ে বড় হচ্ছিলেন, তখন তাঁর আশে-পাশে সমুদ্রের এই ভয়াবহ মূর্ত্তিও তেমনি ভয়াল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে প্রশ্ন শুধু লোকের মনে ভীতি উৎপাদন করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো, তাঁর মনে সে প্রশ্ন স্থায়ী বাসা নিয়ে বসলো। পৃথিবীর

চেহারা যদি গোল হয়, এবং ভূগোল বলে তা নিশ্চয়ই গোল···তাহলে এই মহাসাগরের ওপারে নিশ্চয়ই আছে মাটির পৃথিবী···এবং সে মাটির পৃথিবী হলো এশিয়া··· যেখানে আছে ভারতবর্ষ···যেখানকার মাটিতে সোনা, নদীর জলে সোনা···স্থলপথে সে-ভারতে যাবার পথ আজ বন্ধ···কারণ যে-পথ দিয়ে যেতে হবে, সে-পথ দুর্দ্ধর্ষ আরবদের অধিকারে······তারা বিধর্ম্মী ক্রিশ্চানদের সহ্য করে না···ভারতে পৌঁছবার দ্বিতীয় পথ আছে, এই মহাসাগরের তরঙ্গের মধ্যে···এই আটলান্টিক মহাসাগর ধরে সোজা পশ্চিমমুখো গেলে নিশ্চয়ই মাটি পাওয়া যাবে···ভারতবর্ষের মাটি···কিন্তু কে যাবে এই সাগরের মধ্যে ?

নিশিদিন তিনি আপনার মধ্যে সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকেন···তাঁর মনে হয়, সাগর-তরঙ্গের মধ্য থেকে কে যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে! তাঁর অন্তর তারস্বরে চীৎকার করে উঠে সায় দেয়···আমি যাব··· আমি যাব···

বিশ্বাস ও উদ্যোগ

সাগর যাকে ডাকে, পৃথিবী তাকে ধরে রাখতে পারে না। এমনি দুর্নিবার সাগরের ডাক!

কলম্বাস যখন যৌবনে পা দিলেন, তখন থেকেই তিনি সাগর-জলের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিত হতে লাগলেন। যখনি সুবিধা পেতেন সমুদ্র-পথে যাবার, তখনই সে-সুযোগ গ্রহণ করতেন। এইভাবে একটু-একটু করে তিনি তখনকার প্রচলিত সব সাগর-পথের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন...উত্তর আফ্রিকার বাণিজ্যের জন্যে যে-সব জাহাজ যাতায়াত করতো, তাতে তিনি নাবিকের কাজ নিয়ে যাতায়াত সুরু করলেন।

সেই সময় উত্তর আফ্রিকা আর স্পেন-পর্তুগালের মধ্যে সমুদ্র-পথে ছোটখাটো জলযুদ্ধ প্রায়ই লেগে থাকতো। একবার তিনি এক যুদ্ধের জাহাজে আফ্রিকার টিউনিস্ শহরে গিয়ে উপস্থিত হন এবং এক জলযুদ্ধের মধ্যে পড়ে যান। সেই যুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেন। সেই থেকে ভূমধ্যসাগরে ছোটখাটো জলযুদ্ধে প্রায়ই তিনি যোগদান করতেন। এই সমস্ত

ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি নাবিকদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করছিলেন। যখন সমুদ্রে না বেরুতেন, তখন তিনি ম্যাপ তৈরী করে জীবিকা অর্জ্জন করতেন।

এই সমস্ত ম্যাপ সেই সময় নাবিকদের খুব কাজে লাগতো। এই ম্যাপ তৈরী করার কাজ শুধু যে তিনি জীবিকা অর্জ্জনের জন্যে গ্রহণ করেছিলেন, তা নয়, তিনি নিজেও ম্যাপের মধ্যে দিয়ে খুঁজলেন, সেই সমুদ্র-পথ··· যে-পথ দিয়ে একদিন তিনি অজানা পৃথিবীর সন্ধানে বেরুবেন। এই ম্যাপ তৈরী করতে-করতে তাঁর ধারণা আরো স্পষ্টতর হলো যে, আটলান্টিক মহাসাগর ধরে পশ্চিম মুখে গেলে নিশ্চয়ই মাটির সন্ধান পাওয়া যাবে···

এই সময় তিনি সমুদ্র-পথে আইসল্যাণ্ডে একবার যান। এই আইসল্যাণ্ডে এসে সম্ভবতঃ তাঁর মনের কল্পনা সঙ্কল্পে পরিণত হয়। কারণ, আইস্‌ল্যাণ্ডে এসে তিনি সেখানকার পুরাণো কাহিনী-প্রসঙ্গে সেই দেশের প্রাচীন তরঙ্গ-বিহারী দুঃসাহসিক লোকদের বিবরণের সঙ্গে পরিচিত হলেন; এবং সেই প্রাচীন নৌ-যাত্রার কাহিনী অনুসন্ধান করে এবং তা পড়ে তিনি জানলেন যে, একদা ইতিহাসের প্রথম

যুগে য়ুরোপ আর একটি মহাদেশ এক সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। তারপর কালক্রমে সেই দুই মহাদেশের মধ্যে এই আটলান্টিক সাগর মহা-বিচ্ছেদ রচনা করে। তারপর থেকে এই দুই মহাদেশের দেখা-সাক্ষাৎ আর হয় নি।

মাঝে-মাঝে সাগরের তরঙ্গের ওপার থেকে পাখীরা আসতো উড়ে, পায়ে তাদের তখনও লেগে থাকতো ওপারের মাটি। সেই মাটির সঙ্গে কখন-কখন ছোট-ছোট ফল-ফুলের বীজ লুকিয়ে থাকতো। য়ুরোপের মাটিতে উড়ে-আসা সেই সব পাখীর পায়ের মাটির স্পর্শে নতুন ধরণের সব গাছ ফুটে উঠতো···মানুষ বিস্ময়ে সমুদ্রের ওপারে চেয়ে থাকতো···

মাঝে-মাঝে এমন সব কাহিনীর সন্ধান তিনি পেলেন যাতে তিনি দেখলেন যে, ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের সমুদ্র-তীরের লোকেরা দেখতো সাগরের জলে বড়-বড় গাছ ভেঙ্গে কোথা থেকে তাদের তীরে এসে লাগছে! অনেক সময় সেই তরঙ্গে ভেসে-আসা গাছের ওপর অজানা পাখীর দল আসতো য়ুরোপে···

আইস্‌ল্যাণ্ডে এসে কলম্বাস বিয়ার্ণি আর লীফের কাহিনী শুনলেন। বহু-বহু যুগ আগে তাঁরা নাকি সমুদ্রের ওপারে গিয়ে নতুন দেশের সন্ধান পেয়েছিলেন। এখনো

আইস্‌ল্যাণ্ডের কবিরা তাঁদের সেই কীর্ত্তির কথা গাথায়-গাথায় অমর করে রেখেছে !

এই সব অভিজ্ঞতা থেকে কলম্বাসের মনের বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ়তর হতে লাগলো···নিশ্চয়ই এই মহাসাগরের ওপারে আছে মাটির দেশ···কিন্তু তিনি দরিদ্র, অসহায়···কে শুনবে তাঁর কথা ? যার কাছেই তিনি সে-কথা বলেন, পাগল বলে তারা তাঁর কথা উড়িয়ে দেয় ।

তখন পর্ত্তুগাল ছিল, য়ুরোপের মধ্যে নৌ-বিদ্যার সব চেয়ে বড় আড্ডা । পর্ত্তুগালের রাজবংশে হেনরী বলে এক রাজকুমার জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি আজীবন নৌ-বিদ্যার সাধনা করে যান । তাঁরই চেষ্টা এবং প্রেরণার ফলে পর্ত্তুগালের নাবিকরা তখন দূর-দূরান্তে সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে নানান্ দ্বীপ আবিষ্কার করেন । নৌ-বিদ্যা শিক্ষার জন্যে তিনি নিজের অর্থে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, সেই নৌ-বিদ্যার কলেজ সেই সময় য়ুরোপে খুব বিখ্যাত ছিল । তাঁর সেই সাধনার ফলে আজ ইতিহাসে তাঁর নাম 'প্রিন্স হেনরী দি ন্যাভিগেটর' (Prince Henry, the Navigator) নামে পরিচিত ।

কলম্বাস নিজের জন্মভূমিতে কোন উৎসাহ না পেয়ে পর্ত্তুগালে আসবার মনস্থ করলেন । পর্ত্তুগালের নৌ-

বিদ্যার খ্যাতি তাঁকে আকর্ষণ করলো···তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করে তাই পর্ত্তুগালে চলে এলেন···যদি সেখানে তাঁর প্রস্তাবের সমর্থন কোথাও মেলে !

পর্ত্তুগালে এসে তাঁর জীবনের এক মহা সৌভাগ্য দেখা দিল। পর্ত্তুগালের রাজধানী লিসবন্ শহরে এসে তিনি সেখানকার এক অতি সম্ভ্রান্ত ও ধনী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন ! এই বিবাহের ফলে তাঁর বিশেষ সুবিধা হলো··· পর্ত্তুগালের বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন এবং তখন সেখানকার বড়-বড় নাবিকেরা এবং বিশেষ করে নৌ-বিদ্যার শিক্ষার কলেজে ভূগোল এবং সমুদ্র-অভিযান সম্বন্ধে যে-সব গবেষণা চলছিল, তার সঙ্গে পরিচিত হলেন।

লিসবন্ শহরে এসে তিনি তাঁর পূর্ব্বগামী পথিকদের সব ভ্রমণ-কাহিনী পড়তে লাগলেন। ক্ষুধিত লোক তার সামনে খাদ্য এলে যেমন ভাবে খায়, কলম্বাস তেমনি আগ্রহের সঙ্গে সেই সব ভ্রমণ-কাহিনী পড়তে লাগলেন··· আশৈশব তাঁর মনে যে স্বপ্নকে তিনি লালন-পালন করে এসেছেন, পর্ত্তুগাল তাঁর সেই স্বপ্নকে জাগ্রত চিন্তার মূর্ত্তিতে ফুটিয়ে তুল্লো—তিনি নিজের ঘরে বসে দিনের পর দিন আটলান্টিক অভিযানের প্ল্যান তৈরী করতে লাগলেন।

যে-সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি, সে-সময় পুঁথিগত বিদ্যা আজকের মত এত প্রসার লাভ করে নি... তখন পুঁথি এত সুলভও ছিল না...তখন বিদ্যা ছিল জ্ঞানী বা অভিজ্ঞ লোকের মনে। যেখানে তাঁরা থাকতেন, সেখানে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে তবে সে বিদ্যা আয়ত্ত করতে হতো...বিশেষ করে ভূগোল বিদ্যা তখন, অতি শৈশব অবস্থায় ছিল...ভাল মানচিত্র পাওয়াই যেতো না...

কলম্বাস ঘুরে-ঘুরে সেই সব জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন...প্রত্যেককে এশিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন...সকলেই এশিয়া সম্বন্ধে এমন সব কথা বলেন, যাতে মনে হয়, সে-দেশ সোনা আর মরকত মণি দিয়ে তৈরী!

সেই সময় টসানেলী নামে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তিনিই ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ মান-চিত্রকর। টসানেলী পৃথিবীর একটী মানচিত্র তৈরী করেছিলেন। সেই মানচিত্র তিনি কলম্বাসকে দেখালেন। তাতে তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে, যেখানে এখন আমেরিকা রয়েছে, সেখানে এশিয়ার মানচিত্র আঁকেন এবং কলম্বাসকে তিনিই প্রথম সায় দিয়ে বল্লেন, তুমি যদি আটলান্টিক মহাসাগর ধরে পশ্চিমমুখো যাও,

তাহলে নিশ্চয়ই তুমি মাটির সন্ধান পাবে···হয়ত ক্যাথে (চীন) নয় ভারতবর্ষ ! তিনিই একমাত্র কলম্বাসের প্রস্তাব শুনে তাঁকে উৎসাহিত করে বল্লেন, তুমি যে কাজ করবে বলে ঠিক করেছ, তাতে অবশ্য চাই অমানুষিক সাহস, মৃত্যুজয়ী পণ···আর পর্ত্তুগালে সে রকম লোকের অভাব হবে না···

টসানেলীর উৎসাহ-বাণীতে কলম্বাস স্থির করলেন, জীবনে আর কোন কাম্য নেই, আর কোন লক্ষ্য নেই··· যেমন করেই হোক, সমুদ্র-পথে ভারতে পৌঁছতে হবে··· সে সমুদ্র যদি আদি-অন্তহীন হয়···তবুও···

সেইদিন থেকে এই এক চিন্তা, এই এক ধ্যান তাঁর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রইলো···

যেখানে কোন নাবিককে দেখেন, তাকেই ডেকে তিনি আলাপ করেন এবং তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার অভিজ্ঞতায় কি বলে ? আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে কি মাটি নেই ?

কেউ বলে, একবার দূর থেকে যেন তারা দেখেছিল, দূরে দিক্-রেখার কাছে তীর-ভূমির মত কালো কি যেন দেখা যাচ্ছে···তাদের সাহস হয় নি এগিয়ে গিয়ে দেখতে···

কলম্বাসের মন বলে, হয়ত তাদের ভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে তারা দূরে দিক্-রেখার মেঘমণ্ডলকে স্থল বলে ভুল করেছে।

একজন বৃদ্ধ নাবিক একবার গল্প বল্লো যে, সমুদ্র-তরঙ্গে দুটী লোকের মৃতদেহ একবার ভেসে আসতে সে দেখেছিল···লোক দুটীর চেহারা, গায়ের রঙ, পোষাক-পরিচ্ছদ তাদের মতন নয়, সম্পূর্ণ আলাদা এক দেশের, আলাদা এক জগতের লোক হবে তারা···

কোন-কোন নাবিক আবার গল্প করলো, দূর-সমুদ্রের ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে তারা ঢেউয়ে নানারকমের বিচিত্র লতা-পাতা ভেসে আসতে দেখেছে···সে-রকম লতা-পাতা তো তাদের দেশে হয় না—আর মাটি না থাকলে লতা-পাতা আসবেই বা কোথা থেকে ?

ক্রমশ-ক্রমশ কলম্বাসের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল যে, এই সীমাহীন মহাসাগর ধরে একটানা পশ্চিমমুখো গেলে, তিনি নিশ্চয়ই মাটির সন্ধান পাবেন···এশিয়ার মাটি···ভারতবর্ষের মাটি ! ধার্ম্মিক লোক যেমন বিশ্বাস করে ঈশ্বরের অস্তিত্বে, কলম্বাসের মনে তেমনি আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে নতুন দেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস জেগে উঠলো···কোন কিছুই তাঁর মনের এ-বিশ্বাস টলাতে পারলো না···

কিন্তু যতক্ষণ না নৌকো করে, তরঙ্গের লোণাজলে স্নান করে, সেই নতুন দেশে না পৌঁছতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁর বিশ্বাসের তো কোন মূল্য নেই! কিন্তু সেই বিরাট বিশাল মহাসাগর পার হতে হলে, সঙ্গে বহু লোকজন দরকার, প্রত্যেক লোকটীই অভিজ্ঞ নাবিক হওয়া চাই, এবং তাঁরই মত প্রত্যেকের অন্তরে এই বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাসকে সত্যে পরিণত করবার উৎসাহ ও শক্তি থাকা দরকার, চাই এই দীর্ঘ যাত্রার উপযুক্ত নৌকো, খাদ্য···কিন্তু এই বিরাট অভিযানের জন্যে যে লোকবল এবং অর্থবল প্রয়োজন, তা একজন সাধারণ লোকের দ্বারা কখনও সম্ভব হতে পারে না; একমাত্র দেশের রাজা বা দেশের শাসকবর্গ এ উদ্যোগ করতে পারেন। তাই তিনি স্থির করলেন যে, তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে তিনি তাঁদেরই দ্বারস্থ হবেন···

আঠারো বছরের চেষ্টার ফলে

নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করে কলম্বাস তখন এক রকম পর্তুগালেই বসবাস করছিলেন, পর্তুগালকেই তিনি তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাই তিনি স্থির করলেন যে, প্রথমে পর্তুগালের রাজার শরণাপন্ন হবেন।

তখন পর্তুগালের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় জন। বহু চেষ্টাচরিত্র করে তিনি রাজা জনের সাক্ষাৎ পেলেন। তাঁর অন্তরের বাসনার কথা তিনি জনকে জানালেন— সমুদ্রের ওপারে সোণার দেশ আছে, যদি তিনি অভিযানের আয়োজন করে দেন, তাহলে কলম্বাস সাগর-তরঙ্গ পেরিয়ে সেই নতুন দেশ…পর্তুগালের হয়ে অধিকার করেন।

রাজা জন কলম্বাসের প্রস্তাব শুনলেন…কিন্তু নিজে কিছু মতামত জানালেন না। তিনি বল্লেন, আমার সভাসদ্দের সঙ্গে পরামর্শ না করে তোমাকে কোন কথা দিতে পারি না।

কলম্বাসকে বিদায় দিয়ে রাজা জন তাঁর সভাসদ্দের ডেকে সমস্ত কথা বল্লেন। তাঁরা সেই প্রস্তাব শুনে ব্যঙ্গ

করে উঠলেন ; কেউ-কেউ বল্লেন যে, এত-এত টাকার প্রয়োজন হবে যে, একজন উন্মাদের কথা শুনে রাজকোষ থেকে অতখানি অর্থ ব্যয় করা ঠিক হবে না।

কলম্বাস যখন আবার রাজা জনের সঙ্গে দেখা করলেন, তখন তিনি কলম্বাসকে জানালেন যে, তিনি এই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করতে অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত নন্।

কিন্তু কলম্বাসকে বিদায় দিয়ে রাজা জন গোপনে একদল নাবিককে কলম্বাসের পথ অনুসারে সমুদ্রে পাঠালেন। কারণ, কলম্বাসের কথায় রাজা জনের মনে দুরাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল ; যদি সত্য-সত্যই লোকটার কথা ঠিক হয়, তাহলে তিনি পর্ত্তুগালের রাজ্যের সীমানা অনায়াসে বাড়াতে পারেন। কলম্বাস কিন্তু এ-সব ব্যাপারের কিছুই জানলেন না।

রাজা জন যে-সব নাবিককে পাঠালেন, তারা পশ্চিম মুখ ধরে কয়েকদিন যাত্রা করে দেখেন, কোথায় তীর, কোথায় মাটি ! যতদূর অগ্রসর হয়, ততই সমুদ্র যেন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে ! তারা হতাশ হয়ে ফিরে এসে রাজা জনকে জানালো যে, কোথায় তীর ! লোকটা হয় ধাপ্পাবাজ, নয় উন্মাদ !

কলম্বাস যখন জানতে পারলেন যে পর্ত্তুগালের রাজা

তাঁকে গোপন করে তাঁর প্ল্যান অনুযায়ী এক অভিযান পাঠিয়েছিলেন, তখন রাগে ও ঘৃণায় তাঁর মন ভরে গেল। যে দেশের রাজা এমন প্রবঞ্চনার কাজ করতে পারে, সে দেশে তিনি বাস করতে চাইলেন না। চিরকালের মত প্রতিজ্ঞা করে তিনি পর্ত্তুগাল ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর মনে যে বিশ্বাস তিনি আজীবনের অনুশীলনে গড়ে তুলেছিলেন, সে বিশ্বাসকে আরো সবলে আঁকড়ে ধরলেন।

পর্ত্তুগাল ত্যাগ করে য়ুরোপের এক রাজার দরজা থেকে আর-এক রাজার দরজায় তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। প্রত্যেকেই উন্মাদ বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। ঘুরতে-ঘুরতে তিনি তাঁর জন্মভূমি জেনোয়া শহরে এলেন। সেখানেও কারুর কাছে কোন আশার বাণী তিনি পেলেন না।

হতাশ হয়ে তিনি চিঠি লিখে ইংলণ্ডের রাজার কাছে আবেদন জানালেন। কেউ-কেউ বলেন, তিনি তাঁর ভাই বার্থলোমিউকে ইংলণ্ডের রাজার কাছে পাঠিয়েছিলেন, এবং ভাইকে জাহাজে করে ইংলণ্ডে পাঠাতে, তাঁর যথাসর্ব্বস্ব তাঁকে বেচতে হয়েছিল জলের দরে!

ইংলণ্ডের সিংহাসনে তখন বসে ছিলেন রাজা সপ্তম হেনরী। বার্থলোমিউ কিন্তু ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছতে

পারলেন না। পথে জলদস্যুর আক্রমণে তাঁদের জাহাজ বিপন্ন হয় এবং তিনি তাঁদের হাতে বন্দী হলেন। বহুদিন অজানা দেশে বন্দীজীবন যাপন করার পর···তিনি কোনমতে প্রাণ নিয়ে শেষে পালিয়ে আসেন।

ইত্যবসরে রাজা জনের মনে অনুশোচনা এলো। তিনি বুঝলেন যে, কলম্বাসের সঙ্গে তিনি রাজোচিত ব্যবহার করেন নি। তিনি কলম্বাসকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে লোক পাঠালেন, কিন্তু কলম্বাস আর ফিরলেন না। রাজা হয়ে যে লোক তাঁকে একবার এ-রকম প্রবঞ্চনা করেছে, তাঁর আশ্রয় নেওয়া তিনি যুক্তি-সঙ্গত বলে মনে করলেন না।

কলম্বাস দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ছিল নিজের বিশ্বাসের ওপর অটল শ্রদ্ধা; তাই সেদিন সমগ্র য়ুরোপের উপহাসের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর নিজের মনের ধারণাকে অটুট রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু এইভাবে য়ুরোপের এক রাজার দরজা থেকে আর-এক রাজার দরজায় ধন্না দিতে-দিতে···তাঁর স্ত্রীর যা কিছু অর্থ ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেল। এই সময় দুর্ভাগ্যবশত তাঁর স্ত্রীও মারা গেলেন,—দিয়েগো নামে একটী ছোট্ট ছেলে রেখে।

সেই ছোট্ট ছেলেটীর হাত ধরে তিনি য়ুরোপের রাজধানীর পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন···এত প্রত্যাখ্যানেও তাঁর মনের বিশ্বাস এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হলো না···অল্প বয়সে ভাবনায় তাঁর মাথার সমস্ত চুল একেবারে শাদা হয়ে গেল।

সেই সময় তাঁর দৃষ্টি পড়লো স্পেনের ওপর। তবে প্রথমেই তিনি স্পেনের রাজদরবার পর্য্যন্ত এগুতে সাহস করলেন না। স্পেনের দুজন ডিউক—মেদিনা-সিদোনিয়ার ডিউক ও মেদিনা-সেলীর ডিউক সে সময় ঐশ্বর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন···কলম্বাস তাঁদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেখানেও কোন ফললাভ হলো না। তবে এইটুকু সুবিধা হলো যে মেদিনা-সেলীর ডিউক কলম্বাসকে রাণী ইসাবেলার কাছে যাওয়ার উপদেশ দিলেন।

স্পেনের তখন বড় গৌরবের দিন। স্পেনের সিংহাসনে তখন বসে ছিলেন রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড এবং তাঁর সুযোগ্যা স্ত্রী রাণী ইসাবেলা। দয়াবতী এবং বুদ্ধিমতী বলে রাণী ইসাবেলার খ্যাতি তখন য়ুরোপের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ডিউকের উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে কলম্বাস স্থির করলেন, তিনি একবার রাণী ইসাবেলার শরণাপন্ন হবেন।

ছেলের হাত ধরে তিনি স্পেনে এলেন। রাণী ইসাবেলা তাঁর সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনলেন। কলম্বাস যেভাবে তাঁর আজীবন-সঞ্চিত কল্পনার কথা রাণী ইসাবেলার সামনে বল্লেন, তাতে মনে হলো যে তিনি যেন চোখের সামনে সেই অজানা নতুন দেশের তীর দেখতে পাচ্ছেন! তাঁর কথা শুনে রাণী ইসাবেলা কতকটা বিশ্বাস করলেন এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত হলেন।

কিন্তু কলম্বাসের মনে এই প্রস্তাবের পেছনে এক বিরাট দুরাকাঙ্ক্ষা এতদিনে গড়ে উঠেছিল। কিসের জন্য তিনি এই অসাধ্যসাধন-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করতে চলেছেন? তাই তিনি তাঁর পুরস্কার-স্বরূপ জানালেন যে, যদি আমি কৃতকার্য্য হই, তাহলে স্পেনের নামে যে-সব দেশ আমি অধিকার করবো, আমাকে সেই সব দেশের রাজপ্রতিনিধি করতে হবে...এবং পশ্চিম আটলান্টিকে আমি যতদূর যাব, ততদূর পর্য্যন্ত আপনার নৌ-বাহিনীর Admiral আমাকে করতে হবে...যে-সব অর্থ এবং ঐশ্বর্য্য আমি আহরণ করে আনবো, তার দশভাগের একভাগ আমার প্রাপ্য হবে... কারণ আমার পুত্রকে আমি এমন ঐশ্বর্য্য দিয়ে যেতে চাই, যাতে আমার নাম ও বংশের নাম সগৌরবে আমার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে পারে।

এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁদের ভিতরে ডেকে নিলেন

[পৃঃ ২৫

কলম্বাসের পুরস্কারের কথা শুনে রাণী ইসাবেলা কোন উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। তাঁর মনে হলো যে, কলম্বাস পুরস্কার-স্বরূপ খুব বেশী দাবী করছেন। তাঁর মন্ত্রীরাও সেই কথা জানালো। ইতিমধ্যে স্পেন এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। কলম্বাসের আশা-তরু আবার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। যুদ্ধের ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে রাণী ইসাবেলা কলম্বাসের প্রস্তাবের কথা এক রকম ভুলেই গেলেন

উত্তরের আশায় অপেক্ষা করে থেকে-থেকে কলম্বাস যখন বুঝলেন যে কোন উত্তর আসবে না, তখন তিনি মাতৃহীন সেই বালকের হাত ধরে···স্পেন ত্যাগ করে··· ফ্রান্সে যাবার মনস্থ করলেন। ফ্রান্সের রাজার দরবারে যাবার জন্যে তিনি স্পেনের প্যালোস্ বন্দরে এলেন। সেখান থেকে ফ্রান্সের জাহাজ ছাড়ে।

প্যালোস্ শহরে যখন তিনি এসে পৌঁছলেন, তখন তিনি ক্ষুৎ-পিপাসায় একেবারে ভেঙে পড়েছেন, বিশেষ করে তাঁর পুত্র দিয়িগো আর চলতে পারে না। শহর খুঁজে তিনি এক মঠের দ্বারে উপস্থিত হলেন। দরজায় করাঘাত করতেই ভেতর থেকে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এসে···দরজা খুলে তাঁদের ভেতরে ডেকে নিলেন।

সন্ন্যাসী পথশ্রান্ত পথিকদের রুটী এবং জল খেতে দিলেন।

আহারান্তে কলম্বাস সেই সহৃদয় সন্ন্যাসীকে তাঁর জীবনের করুণ কাহিনী সমস্ত বল্লেন। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সন্ন্যাসী সেই অতিথির অপূর্ব্ব কথা সব শুনলেন। শুনতে-শুনতে তাঁর উৎসাহ জেগে উঠলো, তিনি বুঝলেন যে-লোক নিজের অন্তরের আদর্শের জন্যে এতখানি ক্লেশ সহ্য করতে পারে এবং যার এতখানি ধৈর্য্য, সে-লোক কখনই ভণ্ড বা উন্মাদ হতে পারে না। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝলেন যে, এই লোকই জগতে অসাধ্যসাধন করতে পারে। কলম্বাসের সৌভাগ্য যে, এই মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে রাণী ইসাবেলার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তিনি এই সন্ন্যাসীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। কলম্বাসের সমস্ত কথা শুনে তিনি তাঁকে বল্লেন, তুমি স্পেন ত্যাগ করে যেয়ো না। তোমার হয়ে রাণীর কাছে আমি আবেদন নিয়ে যাব, দেখি কি হয়!

এই বলে কলম্বাসকে আশ্বাস দিয়ে সেই মঠেই তিনি কলম্বাস আর তাঁর ছেলেকে কিছুদিনের জন্যে আশ্রয় দিলেন এবং নিজে রাণী ইসাবেলার কাছে কলম্বাসের আবেদন নিয়ে উপস্থিত হলেন।

সন্ন্যাসীর কথায় রাণী ইসাবেলার মন ফিরে গেল। বিশেষ করে যখন তিনি শুনলেন যে কলম্বাস স্পেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীরাজের দরবারে যাচ্ছেন, তখন তিনি সন্ন্যাসীকে বল্লেন, তাকে ফ্রান্সে যেতে আপনি বারণ করুন, আমার অলঙ্কার বেচেও যদি কলম্বাসকে পাঠাতে হয়, তাতেও আমি রাজী আছি।

সন্ন্যাসীর কাছে কলম্বাসের দুর্দ্দশার কথা শুনে… দয়াপরবশ হয়ে…তিনি কলম্বাসের জন্যে দরবারের উপযুক্ত পোষাক দিয়ে পাঠালেন এবং তাঁকে আনবার জন্যে নিজেদের অশ্বশালা থেকে অশ্ব পাঠালেন।

সন্ন্যাসীর কাছে সেই সকল বার্ত্তা শুনে কলম্বাসের অন্তরাত্মা আনন্দে নৃত্য করে উঠলো…তাহলে এতদিন পরে তাঁর ধৈর্য্যের লতায় ফুল ফুটলো! রাণীর দেওয়া পোষাক পরে আনন্দ-উজ্জ্বল মুখে কলম্বাস আবার রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড এবং রাণী ইসাবেলার সম্মুখে উপস্থিত হলেন।

স্পেনের রাজা ও রাণী তাঁর সমস্ত প্রস্তাবেই সম্মত হলেন এবং তাঁরা অঙ্গীকার করলেন যে, কলম্বাস যদি তাঁর কথামত সফল হতে পারেন, তাহলে তাঁকে তাঁরা তাঁর বাসনা-অনুযায়ী সেই সব নূতন দেশের স্পেনের রাজ-প্রতিনিধি করে দেবেন এবং তিনি পশ্চিম আটলান্টিকে

স্পেনের নৌ-বাহিনীর সেনাধ্যক্ষ হবেন এবং যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য তিনি সংগ্রহ করে আনতে পারবেন, তার অংশও তাঁকে দেওয়া হবে। তা ছাড়া রাণী ইসাবেলা অনুগ্রহ করে তাঁর ছেলের ভারও নিজের হাতে তুলে নিলেন...বল্লেন, তাঁর অনুপস্থিতির সময় তাঁর ছেলে রাজপ্রাসাদে রাজকুমারের অনুচররূপে সসম্মানে থাকতে পারবে।

আনন্দে কলম্বাসের চিত্ত আপনা থেকে সকল বিধানের বিধায়কের নিকট কৃতজ্ঞতায় মগ্ন হয়ে গেল। তিনি কালবিলম্ব না করে রাণীর সাহায্যে অভিযানের আয়োজন করতে লাগলেন।

প্যালোসের বন্দর থেকে তিনখানি জাহাজ কেনা হলো। এখন প্রয়োজন—শুধু লোকের। বন্দরে-বন্দরে ঘোষণা করা হলো। কিন্তু ঘোষণার ফলে দেখা গেল, কেহই সাড়া দেয় না। এই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনে অভিজ্ঞ নাবিকেরাও ভয়ে পিছিয়ে গেল। এই উন্মাদের সঙ্গে কে যাবে সেই মৃত্যু-সঙ্কুল অজানা তরঙ্গের রাজ্যের মধ্যে ডুব দিতে? বহু চেষ্টার পর, রাজ-আজ্ঞার চাপে অবশেষে লোকজন জোগাড় হলো। তিনখানি জাহাজের নামকরণ হলো যথাক্রমে 'সাণ্টা মেরিয়া', 'পিন্টা' এবং 'নিনা'।

যে তিনখানি জাহাজে করে সেদিন কলম্বাস বিশাল আটলান্টিক মহাসাগর পার হবার জন্যে যাত্রা করেন, তার মধ্যে যেখানি সবচেয়ে বড়, তার দৈর্ঘ্য হলো মাত্র তেসট্টি ফিট···আজকে এই আয়তনের জাহাজে কেউ সাগরের ভেতরে বেড়াতে যেতেও সাহস করবেন না।

জোর করে যে সব লোক জোগাড় করা হলো, টাকার লোভে এবং রাজ-আদেশের চাপে তারা প্রথমে সম্মত হয়েছিল ; কিন্তু যাবার দিন যতই কাছে আসতে লাগলো, ততই তাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মত বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়লো। কেউ বায়না ধরলো অসুখের, কারুর বাপ-মা বা স্ত্রী আহার-নিদ্রা ছেড়ে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল, কেউ-কেউ বা পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো···

কলম্বাস মহাবিপদে পড়লেন···এই অনিচ্ছুক এবং ভীত লোকদের নিয়ে তিনি কি করে এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করবেন ? কিন্তু তিনি বিচলিত হলেন না। তিনি বুঝলেন যে, এই সব কাতরতায় কর্ণপাত করলে, তাঁর আর অভিযানে যাত্রা করা সম্ভব হবে না···তখন তিনি নির্মম হয়ে উঠলেন এবং কৌশলে সব লোককে জাহাজে আটক করলেন··· তার মধ্যে থেকেও কতক লোক পালিয়ে গেল···

সেই সময় কারাগার থেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েকজন

বে-পরোয়া লোক তিলে-তিলে কারাগারে মরার চেয়ে কলম্বাসের সঙ্গে যেতে সম্মত হলো···কলম্বাস তাদের আদর করে সঙ্গে নিলেন···

এইভাবে মোট একশো কুড়িজন লোক নিয়ে তিনি ১৪৯২ খৃস্টাব্দের ৩রা আগস্ট প্যালোস্ বন্দর থেকে যাত্রা করলেন। তীরে তখন তাঁর সহযাত্রীদের আত্মীয়-স্বজন তারস্বরে ক্রন্দন করছিল এবং প্রত্যেকেই তাঁর নাম ধরে তাঁকে অভিশাপ দিচ্ছিল।

আঠারো বছরের চেস্টার ফলে, সকলের অশ্রুজল আর অভিশাপের মধ্যে দিয়ে···জেনোয়ার সেই অখ্যাত তাঁতির ছেলে···মানব-ইতিহাসের অমর-ধামের দিকে এইভাবে সেদিন যাত্রা সুরু করলেন···

সাগর-জলে

যেদিন কলম্বাস সাগর-জলে ভাসলেন, সেদিন যদি কোনও উপায়ে তিনি দেখতে পেতেন যে, সামনে তাঁর ভাগ্যে কি মহাদুর্দ্দৈব সব জমা হয়ে আছে, তাহলে—তিনি যেই হোন্ না কেন,—কখনই এই অভিযানে এক পা অগ্রসর হতে সাহসী হতেন না।

প্রথম দুদিন এক রকম নির্ব্বিঘ্নেই কাটলো। তৃতীয় দিন থেকে গণ্ডগোল দেখা দিতে লাগলো। তিনখানা জাহাজের ভেতর প্রথমে 'পিন্টা' জাহাজখানা গোলমাল সুরু করলো।

কলম্বাস লক্ষ্য করে দেখলেন যে, যে-লোকটার কাছ থেকে জাহাজখানি কেনা হয়েছিল, লোকটী বদমায়েসী করে তার কতকগুলো অংশ এমন যা-তা ভাবে জোড়াতাড়া দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিল যে, সে নিশ্চয়ই অনুমান করেছিল, জাহাজখানি কিছুদূর গিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হবে।

মার্টিন পিন্‌জোন্ ছিলেন এই অভিযানে পিন্টার ক্যাপ্‌টেন। তিনি নিজে একজন খুব সুদক্ষ নাবিক

ছিলেন। যখন তিনি দেখলেন যে পিন্‌টা গোলমাল সুরু করেছে, তিনি সমুদ্রের মাঝখানে কোন রকমে তাকে মেরামত করে চালাতে লাগলেন ; কিন্তু ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত কোনমতে এসে, পিন্‌টা আর চলতে চাইলো না। কলম্বাস দেখলেন, সে জাহাজ নিয়ে সমুদ্রের ভেতর আর অগ্রসর হওয়া নিরাপদ নয়। কাজেই ক্যানারী দ্বীপ থেকে পিন্‌টার বদলে আর একখানি জাহাজ জোগাড় করবার জন্যে তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন ; কিন্তু সেখানে থাকতে-থাকতেই তিনি খবর পেলেন যে, তাঁকে ধরবার জন্যে পর্ত্তুগালের রাজার আদেশে সৈন্য নিয়ে পর্ত্তুগালের জাহাজ ছুটে আসছে।

পর্ত্তুগালের রাজা যখন শুনলেন যে কলম্বাস স্পেনের হয়ে অভিযানে বেরিয়েছেন, তখন প্রতিবেশীর হিংসায় তিনি মাঝপথে কলম্বাসকে বাধা দেবার জন্যে একদল সৈন্য দিয়ে জাহাজ পাঠিয়েছিলেন।

এই সংবাদ শুনে কলম্বাস ক্যানারী দ্বীপে আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। বিশেষ করে, তিনি আশঙ্কা করলেন, তাঁর সহযাত্রীরা যদি এই সংবাদ জানতে পারে, তাহলে তারা তো আর অগ্রসর হবে না—সমস্ত আয়োজন সূচনাতেই বিনষ্ট হয়ে যাবে! তাই আর কালবিলম্ব না

করে, ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে সেই ভগ্ন-দেহ পিন্‌টাকে নিয়েই তিনি সমুদ্রের ভেতর ঢুকে পড়লেন।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে, পর্ত্তুগালের জাহাজ আর তাঁর নাগাল পেতে পারে না। তিনি কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত কিন্তু তাঁরা তট-ভূমি থেকে সমুদ্রের মধ্যে বেশী দূরে অগ্রসর হন নি…তট-ভূমি দৃষ্টি-সীমানার মধ্যে রেখেই তাঁরা অগ্রসর হচ্ছিলেন; কিন্তু ক্রমশ তট-রেখা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো এবং সেই সঙ্গে বাতাসের চেহারাও বদলাতে লাগলো।

এতদিন শান্ত বাতাসে এক রকম নির্ব্বিঘ্নেই তাঁরা অগ্রসর হয়ে আসছিলেন। যাত্রা করবার সময় তাঁর সহযাত্রীদের মনে যে আশঙ্কা ছিল, তা ঐ ক'দিনের সুবাতাসে কথঞ্চিৎ বিদূরিত হয়ে আসছিল; কিন্তু তট-রেখা থেকে তাঁরা যতই সমুদ্রের ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলেন, বাতাসের শান্ত মূর্ত্তি ততই পরিবর্ত্তিত হয়ে যেতে লাগলো এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সহযাত্রীদের মনে আবার আতঙ্ক মাথা তুলে জেগে উঠতে লাগলো।

ক্রমশ বাতাস ঝড়ে পরিণত হলো, ঝড়ের সঙ্গে-সঙ্গে তরঙ্গের চেহারা বদলাতে লাগলো…সমুদ্র উন্মাদ নর্ত্তনে

যেন লাফিয়ে চলেছে আকাশের মেঘকে স্পর্শ করবার জন্যে! যেদিকে চাও, সেদিকেই সেই মেঘস্পর্শী তরঙ্গের দল···তার মধ্যে তিন টুক্‌রো তৃণখণ্ডের মত তিনখানি জাহাজ ঢেউ-এর মাথায় উঠছে আর নামছে···

কলম্বাসের সহযাত্রীরা ভেঙে পড়লো···

কলম্বাস তাদের বোঝালেন যে সমুদ্রের এই অস্বাভাবিক অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না···কিন্তু তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত হবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না··· বরঞ্চ কলম্বাসের আশ্বাস-বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্যই যেন দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, সেই ঝঞ্ঝা আর সেই তরঙ্গে চল্লো উন্মাদ সংগ্রাম···

দূরে ফেলে-আসা তট-ভূমির জন্যে সহযাত্রী নাবিকদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনিই বিনির্গত হতে লাগলো ···সমুদ্রের এ রূপ তো তারা দেখে নি···

ঝড়-ঝাপ্‌টা যে তারা ভোগ করে নি, তা নয়, কিন্তু এ-রকম অবিচ্ছেদ ঝড় আর তরঙ্গের সংগ্রাম তারা কখনও কল্পনার চোখেও দেখে নি···

দুর্দ্ধর্ষ শক্তিমান সব পুরুষ, আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করে কাঁদতে আরম্ভ করলো···

কলম্বাসকে ফিরে যাবার জন্যে তারা সকলে মিলে

অনুরোধ করলো, কিন্তু কলম্বাস অটল। ধীর-স্থির ভাবে তিনি নানা প্রলোভন দেখিয়ে, নানা স্তোকবাক্য দিয়ে তাদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন ; তিনি বল্লেন, যাত্রা যখন সুরু হয়েছে, ফিরে যাবার কথা ভাবা বৃথা...সামনেই আছে এশিয়ার তট-ভূমি...সেখানকার ধূলোতে স্বর্ণ-রেণু... সেখানকার পাহাড়ে প্রস্তরখণ্ডের মত পড়ে আছে, মণি-মাণিক্য...অজস্র ঐশ্বর্য্য...

ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে তারা কথঞ্চিৎ শান্ত হলো... পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে সাহসে বুক বাঁধবার চেষ্টা করতে লাগলো...কিন্তু তারা কতদূরই বা এসেছে... আর কতদূরই বা যেতে হবে ? আর কতদূরে আছে সেই স্বর্ণ-রেণুর দেশ, মণি-মরকতের পাহাড় ?

কলম্বাস বুঝলেন তার সহযাত্রীদের নিয়ে তাঁকে বিপদে পড়তে হবে। কারণ এ-কথাটা তিনি জানতেন যে, যে-পথটুকু আসা হয়েছে, সে-পথটুকু যেতে হবে তার তুলনায় তা কিছুই নয়। তখন তিনি চাতুরী করে দুটো লগ্-বই (Log-Book) তৈরী করলেন...একটা সত্যি-কারের লগ্-বই, তাঁর নিজের জন্যে ; তাতে তিনি লিখতেন, সত্যি-সত্যি কত মাইল আসা হলো, কোন্ দিকে জাহাজ যাচ্ছে, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়। সেটা তিনি গোপনে

রাখতেন। আর একটী লগ্-বই করলেন, সেটী প্রকাশ্যে সকলের দেখবার জন্যে থাকতো, তাতে তিনি মিথ্যা করে আশ্বাসজনক ভাবে সব-কিছু লিখতেন...যখনই তাঁর সহযাত্রীরা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রশ্ন করতো, তিনি দ্বিতীয় লগ্-বইখানি তাদের সামনে তুলে ধরতেন...

আরো কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আর এক বিপদ দেখা দিল...মাঝে-মাঝে এমন নিবিড় কুয়াসা পড়তে লাগলো যে, তিনখানি জাহাজই কেউ কাউকে আর দেখতে পেতো না...সেই সময় কলম্বাসের ভয় হতো যে, হয়ত অন্য জাহাজ দু'খানা সেই কুয়াসার অন্তরালের সুবিধা নিয়ে উল্টো মুখ করে চলতে পারে...

ক্রমশ নাবিকদের ব্যবহারে তাঁর সন্দেহ ও আশঙ্কা দৃঢ়তর হতে লাগলো...তিনি লক্ষ্য করে দেখতে লাগলেন যে, যাদের হাতে জাহাজের গতি-নির্ণয়ের ভার ছিল, তারা রোজ একটু-একটু করে উত্তর-পূর্ব্বদিকে মুখ করে জাহাজ-গুলো চালাবার চেষ্টা করছে...সেইজন্যে দিবারাত্রি তাঁকে সতর্ক হয়ে থাকতে হোতো।

জাহাজের প্রত্যেক কর্ম্মচারী যে-কোন মুহূর্ত্তে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে...বিরুদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে এমন অনিচ্ছুক সহযাত্রীদের নিয়ে, অজানা পথে

আর কাউকে কোন দিন এমন করে অভিযানে বেরুতে হয় নি···অবশেষে জাহাজের কম্পাসের ভার তিনি নিজেই নিলেন।

এই সময় তিনি তাঁর ডায়েরীতে এক জায়গায় লিখে-ছিলেন ঃ চোখ থেকে নিদ্রা একেবারে চলে গেল···বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করা যায়, কিন্তু বিরুদ্ধ মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম, আরো ভয়ঙ্কর···বিশেষ করে, যাদের সহায়ের ওপর নির্ভর করে পথ চলতে হবে, প্রতি মুহূর্ত্তে যদি তারাই বিপথের চিন্তা করে···

এমনি করে দিনের পর দিন চলে গেল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ···চারিদিকে শুধু জল আর জল···লবণাক্ত নীল জল আর শুভ্র ফেনায় সমুদ্রের ক্রূর হাসি···

সেই লবণাম্বুধির একঘেয়েমার মধ্যে মাঝে-মাঝে কদাচিৎ দু'একটি বৈচিত্র্যের দেখা পাওয়া যেতে লাগলো···একদিন হঠাৎ দেখা গেল, ঢেউ-এ একটা ভাঙা মাস্তুল ভেসে চলেছে···

সেই ভগ্ন-তরীর নিদর্শন দেখে নাবিকদের মনে নতুন করে আবার আশঙ্কা জেগে উঠলো···হয়ত একদিন এমনি ভাবে তাদেরও তরা ভেঙে তরঙ্গে ভেসে যাবে···

ভীত লোকের মনে আশার কারণও বিভীষিকার রূপ

নিয়ে দেখা দেয়···এমনি আশঙ্কার মধ্যে হঠাৎ একদিন তারা এক জোড়া বিচিত্র পাখী মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলো···

কোথা হতে এলো এই পাখী ? এই আশার শিখা জ্বলে উঠতে না উঠতে হঠাৎ আকাশে ধূম-পুচ্ছ ধূমকেতু দেখা দিল···সভয়ে নাবিকেরা দেখলো, ধূমকেতুর ল্যাজটা তাদের সামনেই আগুনের ঝাঁটার মত সাগর-জলে যেন নেমে গিয়েছে···

তখন ধূমকেতু সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে এক ভয়াবহ ধারণা ছিল···ধূমকেতু হলো বিপদের অগ্রদূত··· বিশেষ করে সেই দিক্‌হীন সমুদ্রের মাঝখানে তাদের ভীত, আতঙ্কিত মনে সেই ধূমকেতুর অকস্মাৎ আবির্ভাব যেন তাদের অচির-বিনাশের ভবিষ্যৎ-বাণীর মত তাদের সামনে জেগে উঠলো···

তারা সকলে হাল ছেড়ে দিয়ে সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো, আর নয় !

সেই সময় হঠাৎ পিন্‌টা জাহাজ থেকে ইঙ্গিতে সংবাদ জানানো হলো,—সামনে তারা যেন একফালি জমি দেখতে পাচ্ছে···

চকিত উল্লাসে তাদের সকলের বুক দুলে উঠলো

…মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত আশঙ্কা দূরে ফেলে দিয়ে তারা আবার হাল ধরলো…উল্লাসে চীৎকার করতে-করতে তারা দিক্-রেখায় দৃশ্যমান সেই তট-রেখার দিকে জাহাজ ছুটিয়ে চল্লো—কিন্তু কিছুক্ষণ যাবার পর, তারা বুঝলো, তাদের দৃষ্টি-বিভ্রম ! ও তট-রেখা নয়…দিগন্ত-রেখার ধূসর মেঘ …সমুদ্রে স্থলের মরীচিকা…

সমস্ত নাবিক এবার ক্ষেপে উঠলো…কিন্তু তাদের নায়কের মুখে ভয়ের রেখামাত্র নেই…দিনের পর দিন তিনি সেই এক আদেশ একই কণ্ঠস্বরে দিয়ে চলেছেন, 'Westward always…বরাবর পশ্চিম দিকে…সোজা পশ্চিমমুখো চল ।'

তারা বুঝলো যে একজন উন্মাদ লোকের পাল্লায় পড়ে তারা নিশ্চিত মরণের রাজ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে… কিম্বা সমুদ্রের মধ্যে যে মায়া-রাজ্যের কথা তারা শুনেছিল, তারই মধ্যে তারা এসে পড়েছে…মাঝে-মাঝে তারা যে জীবনের চিহ্ন দেখে,—ভেসে-আসা কাঠ, উড়ে-যাওয়া পাখী,—ও শুধু মায়ারাজ্যের যাদু…

আরো কিছুদূর যাওয়ার পর সবাই তারা দেখলো, কেমন এক ধরণের সামুদ্রিক আগাছা ভেসে আসছে… এগিয়ে গিয়ে দেখে, এমন আগাছা-বন সমুদ্রের ভেতরে

যে, তাদের জাহাজ অতি কষ্টে তা এড়িয়ে এগুতে পারলো···

হঠাৎ সমুদ্রের মাঝখানে কোথা থেকে এলো এমন আগাছার বন ? এ নিশ্চয়ই কোন যাত্নরাজ্যে তারা চলে এসেছে···

কলম্বাস তাদের অনেক বোঝালেন—আর বেশী দূর নেই···তারা এসে পড়েছে···

কলম্বাসের কথার সমর্থনের জন্যে কোথা থেকে তিনটী পাখী জাহাজের মাস্তুলের ওপর হুদিন ধরে বসে আপনার মনে গান গাইতে লাগলো···শান্ত সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্যের রূপালি কিরণ ঝিকমিক করে উঠলো—নাবিকদের মনে আবার আশা জেগে উঠলো···

পাখীদের দেখিয়ে কলম্বাস আশ্বাস দিয়ে বল্লেন, ওরা হলো মাটির জীব···যদিও ওরা উড়ে আকাশে, কিন্তু মাটিতে গাছের ওপর থাকে ওদের নীড়···ওরা এসেছে সামনে মাটির বার্ত্তাবহ হয়ে···

নাবিকরা জাহাজের পাটাতনে বসে সেদিন সূর্য্যকরে শান্ত সমুদ্র থেকে জল তুলে কথঞ্চিৎ আশ্বস্তচিত্তে স্নান করতে লাগলো···এমন সময় সেই নির্ম্মল নির্মেঘ আকাশ দেখতে-দেখতে কালো হয়ে গেল···শান্ত সাগর গর্জ্জন করে

অশান্ত হয়ে উঠলো···নিমেষের মধ্যে যে ছিল শাদা, সে হয়ে গেল কালো···যে ছিল শান্ত, সে হয়ে উঠলো, দুর্দ্দান্ত! কোথায় উড়ে গেল পাখা, চলে গেল সূর্য্যের আলো, সেই সঙ্গে ভেঙে ভেসে চলে গেল নাবিকদের মনে যেটুকু আশা বা আশ্বাস জেগে উঠেছিল—

তাদের বুঝতে আর বাকী রইলো না যে, তারা যাদুর রাজ্যে এসে পড়েছে···নইলে, এইমাত্র শান্ত সমুদ্রে সূর্য্যের আলোয় ঝিকমিক করছিল···কোথা থেকে এলো মেঘ, এলো ঝড়, জাগলো তুফান!

কলম্বাস নিজেও বিস্মিত হয়ে গেলেন, এমন সূর্য্যকরোজ্জ্বল গগন থেকে যে এমন অতর্কিতে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হতে পারে, সে অভিজ্ঞতা তখন পর্য্যন্ত তাঁর হয় নি···সমুদ্রের মাঝখানে মাঝে-মাঝে এই রকম অতর্কিত ভাবে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটে···

এবার আর তেমন জোরের সঙ্গে তিনি সহযাত্রীদের আশ্বাস দিতে পারলেন না···তখন প্রকাশ্যে তারা তাঁকে উপহাস করতে আরম্ভ করতে লাগলো···

ব্যঙ্গ আর উপহাসের প্রকাশ্য আত্মপ্রকাশের তলায় কলম্বাস বুঝলেন, একটা গভীর ষড়যন্ত্র তাঁর বিরুদ্ধে চলছে ···তিনি একা···আর তাঁর বিরুদ্ধে···একশো উনিশ জন···

নাবিকদের মধ্যে তখন সত্যই বিদ্রোহের শিখা মাথা তুলে জেগে উঠলো—তারা বল্লো, লোকটা পাগল··· নিজে কবে স্পেনের রাজ-প্রতিনিধি হবে, সেই নেশায় লোকটা উন্মাদ···সেই উন্মাদের পাল্লায় পড়ে আমরাও বেঘোরে মরতে চলেছি···কিন্তু কেন? কেন আমরা তাকে মানবো? আজও, তবু যা হোক্ কিছু ক্ষিদের সময় মুখে দিতে পারছি, কিন্তু আর কয়েক দিন পরে, জাহাজে যা খাদ্য আছে তা-ও তো শেষ হয়ে যাবে···তখন কি সমুদ্রের লোণাজল আর ভিজে বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকা যাবে? অতএব এসো, সবাই মিলে, তাঁকে ধরে, এই সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে, এখনো ফেরবার চেষ্টা করি।

কিন্তু কে কলম্বাসের গায়ে হাত দেবে? সমুদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করতে-করতে লোকটার চেহারার মধ্যে খানিকটা যেন সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য ঢুকে গিয়েছিল···একদল লোক আসে, মানুষকে শাসন করবার জন্যেই···তাদের কথা, তাদের দেহের ভঙ্গী, তাদের মুখের প্রত্যেকটী রেখা··· তাদের এমন একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্বে মণ্ডিত করে যে, তাকে স্পর্শ করা, তাকে আঘাত করা···সাধারণ মানুষের পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার হয় না! কিন্তু তবুও কলম্বাস জানতেন যে, আর বেশী দিন এভাবে তারা তাঁকে মানতে

পারে না···ভয়ে আতঙ্কে এবং আশাহীনতায় তারা প্রায় সেই সীমানায় এসে পড়েছে, যেখানে আঘাত করা ছাড়া বাঁচবার আর কোন উপায় থাকে না!

একদিন যখন বুঝলেন যে তাঁর জাহাজের নাবিকেরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার জন্যে সমবেত হয়েছে, তিনি একা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ভাবে তাঁদের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন···গম্ভীর ভাবে তাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন, আমি জানি, তোমরা কেন এখানে সমবেত হয়েছ···আমাকে এই সমুদ্রের জলে ফেলে রেখে তোমরা ফিরে যাবে? কিন্তু ভেবেছ কি যাবে কোথায়? কে তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে? আর আমাকে বাদ দিয়ে দেশে ফিরে গেলে ভেবেছ, রাজা তোমাদের খুশী হবেন···? তোমাদের প্রত্যেকের হবে মৃত্যু-দণ্ড ···অতএব, শান্ত হও···জানি তোমাদের মন উদ্বেল হয়ে উঠেছে···কিন্তু তবুও আমি বলছি···যেমন প্রত্যক্ষ সত্য এই আমি তোমাদের সামনে রয়েছি···তেমনি সত্য, তোমাদের সামনে আছে মাটির তীর-ভূমি···আমি উন্মাদ নই···তোমাদের মত আমারও ঘর-সংসার আছে··· নিজের জীবনের প্রতি মায়া-মমতা আছে···

সহসা তারা সকলেই যেন অস্ত্রহীন হয়ে পড়লো!

সত্যই তো, ফিরে কোথায় যাবে ? আর ফিরে গেলেই কি মৃত্যুর হাত এড়ানো যাবে ? আবার তারা পড়লো, সন্দেহের মধ্যে···সামনেও মৃত্যু···পেছনেও মৃত্যু···তারা যেন ক্রমশ জড় পদার্থের মত হয়ে এলো···

এমন সময় অগ্রগামী পিন্‌টা থেকে তার ক্যাপ্‌টেন আবার ইঙ্গিত করলেন, মাটি···মাটি···সামনে মাটির পৃথিবী···!

পিন্‌টা থেকে সেই সঙ্কেত পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নাবিকেরা ছুটে জাহাজের ডেকে এসে নতজানু হয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালো।

কলম্বাস অনুমান করেছিলেন যে তিনি জাপানের কাছাকাছি এসে পড়েছেন···কৌতূহল দমন করতে না পেরে তিনি জাহাজের মাস্তুলের ওপর চড়ে দেখতে লাগলেন···কিন্তু কোথায় মাটি ? আবার মরীচিকা তাঁদের ছলনা করেছে···দূরে যা মাটির তীর বলে মনে হয়েছিল, তা আসলে হলো মেঘ ··

কলম্বাস ঘোষণা করেছিলেন যে, যে-লোক জাহাজ থেকে প্রথম তীর দেখতে পাবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে···সেইজন্যে প্রত্যেক নাবিকই উদ্‌গ্রীব হয়ে দূরের দিকে চেয়ে থাকতো···এবং যখনই যার মনে হতো যে

তীর দেখেছে, অমনি সে চীৎকার করে উঠতো···তার ফলে জাহাজে প্রত্যেক লোকের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যেতো···কিন্তু প্রত্যেকবারই তারা ভুল করতো···তার ফলে প্রায়ই বিফলতার ব্যথার আঘাত প্রত্যেককেই ভোগ করতে হতো···সেইজন্যে তিনি নতুন করে ঘোষণা করলেন যে, একবার ভুল করে যে চীৎকার করবে, সে যদি পরে সত্যি-সত্যিই তীর দেখতে পায়, তাহলে ঐ ভুলের জন্যে সে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে···

তখন থেকে নাবিকরা সাবধান হয়ে গেল···

পুরস্কার পাক আর নাই পাক, তীর কোথা? অবশেষে একদিন সেই মুহূর্ত্ত এলো···কলম্বাসের নিজের জাহাজে। নাবিকেরা সকলে একত্র হয়ে কাজ ছেড়ে দিয়ে কলম্বাসকে ধরলো, যদি এই মুহূর্ত্তে তিনি জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে স্পেনের দিকে না ফেরেন, তাহলে তারা নতুন ক্যাপ্টেন ঠিক করে, জাহাজ ফিরিয়ে নিয়ে যাবে···তারা আর কেউ অগ্রসর হবে না···

প্রকাশ্য বিদ্রোহ!

ক্ষুধিত বন্য পশুর মত কলম্বাস দেখলেন, তাঁর সামনে সেই মৃত্যুভয়-ভীত মানুষের দল···কি বলে তাঁদের আশ্বাস দেবেন? আশ্বাস দেবার যা কিছু ছিল, তা সব শেষ

হয়ে গিয়েছে! তবে কি এমনি ভাবে এতদিনের সঞ্চিত আশা স্বপ্নের মতই শেষ হয়ে যাবে? তবুও তিনি সেই ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী জনতার সামনে মাথা উঁচু করে বল্লেন, তীরে না পোঁছনো পর্য্যন্ত আমি জাহাজের মুখ ফেরাবো না!

সহসা জনতার মধ্যে নীরবে যেন কিসের একটা তরঙ্গ বয়ে গেল! কলম্বাস একা দাঁড়িয়ে দেখলেন, আক্রমণ করবার আগে বন্য পশু যেমন ভাবে তার নখদন্ত ঘর্ষণ করে, তাঁর সামনে ক্রুদ্ধ জনতা তেমনি নখদন্ত ঘর্ষণ করছে...হয়ত আর কয়েক মিনিট পরে তারা সকলে মিলে তাঁকে আক্রমণ করবে...

সহসা তিনি করজোড় করে, কাতর কণ্ঠে তাদের ডেকে বল্লেন, বন্ধুরা, মাত্র আর তিনদিন সময় আমাকে দাও!

ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ জনতা এ ওর মুখ-চাওয়াচায়ি করে নীরবে আবার যে যার কাজে ফিরে গেল...মাত্র আর তিন দিন সময় বইতো নয়!

দেখতে-দেখতে দু'দিন কেটে গেল...কলম্বাসের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে এলো...তাঁর দেহের ভেতর থেকে যেন প্রতি লোম-কূপে চক্ষু ফুটে উঠেছে—সেই লক্ষ-লক্ষ

চক্ষু দিয়ে তিনি দিক্‌-রেখার দিকে চেয়ে আছেন··· এতদিনের আশা, সে কি এত বেদনার পর, এমনি ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

তৃতীয় দিনের দিন, সকালবেলা হঠাৎ কলম্বাস দেখলেন, সমুদ্রের তরঙ্গে একটা গাছের ডাল ভেসে চলেছে ···তাতে কালোজামের মত ফল তখনও লেগে রয়েছে···

সেই সামান্য একটি ভাঙা ডাল···কি যে আশার আলো নিয়ে এলো···সেদিন রাত্রিবেলা কেউ আর ঘুমোলো না !

হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কলম্বাস যেন দূরে একটা আলো দেখতে পেলেন, তিনি তাঁর জাহাজের ক্যাপ্‌টেনকে ডাকলেন···হাঁ, সত্যিই তো আলো···একটু করে দেখা যাচ্ছে···আবার কিছুক্ষণ দেখা যাচ্ছে না···

একে-একে জাহাজের সব নাবিকেরাই দেখলো··· একসঙ্গে উন্মাদের মত তারা চীৎকার করে উঠলো, "আলো—আলো !"

আশা করতেও ভয় হয়, কতবার আশা ভেঙে গিয়েছে ! তাই তারা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দিগন্ত-রেখার দিকে চেয়ে রইলো···কেউ নড়ে না, চড়ে না, যেন সব পাথরের মানুয···তাদের চোখের পাতা পর্য্যন্ত পড়ে না, যেন পাথরের চোখ···

ঘণ্টাখানেক পরে পিন্‌টা থেকে ছোট্ট নৌকো করে একদল লোক সাণ্টামেরিয়াতে এলো···আবেগে কাঁপতে-কাঁপতে তারা বল্লো, তাদের জাহাজে রডারিগো বলে একজন লোক আছে, তার চোখের দৃষ্টি খুব ধারালো··· সে দেখেছে, দূরে তট-ভূমি রয়েছে···

মানুষের মনের কাঁপনের সঙ্গে তাল রেখে কাঁপতে-কাঁপতে জাহাজ এগিয়ে চল্লো···

কিছুক্ষণ পরে কলম্বাস তাঁর যন্ত্র দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, সামনে তাঁর বহু-আকাঙ্ক্ষিত তট-ভূমি!

উল্লাসে, আনন্দে, আবেগে, তাঁরা সকলে চীৎকার করে উঠলেন! সে চীৎকার আকাশে প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুল্লো।

সামনে তাঁর বহু-আকাঙ্ক্ষিত তট-ভূমি পৃঃ ৪৮

নূতন জগৎ !

১২ই অক্টোবর, ১৪৯২, যখন সূর্য্য উঠলো—একশো কুড়ি জোড়া চোখ আদিম-বিস্ময়ের চোখে সামনে দেখলো …বহুদূর বিস্তৃত ভূ-খণ্ড…সমুদ্র শান্ত…আকাশ নির্মেঘ, নির্ম্মল…চারিদিক প্রসন্ন, স্বচ্ছ, পরিষ্কার !

জাহাজ থেকে তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পেলেন…সামনে তট-ভূমির বনের ভেতর থেকে মানুষেরা একদৃষ্টিতে তাঁদের জাহাজের দিকে চেয়ে আছে…কেউ-কেউ আবার লোকজনদের ডাকছে…বেশ যেন একটা কৌতূহল পড়ে গিয়েছে…

তীরের কাছাকাছি এসে, জাহাজগুলি সমুদ্রের বুকে রেখে, কলম্বাস একটা ছোট্ট নৌকোতে নামলেন। নামবার আগে, স্পেনের জাতীয় পোষাকে, রক্ত-রাঙা মখমলের পরিচ্ছদ ধারণ করলেন, সঙ্গে মার্টিন পিন্ জোন এবং তাঁর ভাই, তাঁদের দুজনের হাতে দু'টি পতাকা, পতাকায় আঁকা সবুজ রঙের ক্রস্, একটিতে 'F' লেখা, আর একটিতে 'I' লেখা, Ferdinand এবং Isabella-র আদ্য অক্ষর। এইভাবে স্পেনের রাজা ও রাণীর নাম-অঙ্কিত পতাকা হাতে তাঁরা তট-ভূমির দিকে অগ্রসর হলেন।

তীরে নেমে মাটিতে নতজানু হয়ে কলম্বাস ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন, তাঁর দু'চোখ দিয়ে তখন আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে; তাঁর দেখাদেখি তাঁর সঙ্গের লোকেরাও নতজানু হয়ে প্রার্থনা জানালো।

প্রার্থনা থেকে উঠে কলম্বাস নিজের হাতে সেই নব-আবিষ্কৃত দেশের মাটিতে স্পেনের পতাকা পুঁতে দিলেন এবং সেই অজানা দেশের নামকরণ করলেন 'সান্ সাল্‌ভাডোর' (San Salvador)।

সঙ্গের নাবিকেরা সকলে সমস্বরে কলম্বাসের জয়গান গেয়ে উঠলো এবং যাত্রার সময় তাদের ব্যবহারের জন্যে তারা অনুতপ্ত হৃদয়ে কলম্বাসের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো…এবং প্রতিজ্ঞা করলো, আমরণ পর্য্যন্ত তারা কলম্বাসের আনুগত্য করবে।

কলম্বাসের ধারণা ছিল যে তিনি ভারতবর্ষের মাটিতেই বা তার কাছাকাছি দেশেই পদার্পণ করেছেন।! তাই তাঁর সহযাত্রীরা সেখানেই তাঁকে Admiral and Viceroy of the Indies—এই উপাধিতে ভূষিত করলো। আনন্দের আতিশয্যে তারা পরস্পার পরস্পারকে আলিঙ্গন করলো… তাদের চোখের সামনে, সকল বিপদ-অন্তে কলম্বাস দেবতার মত এক ঐশ্বরিক বিভূতিতে জেগে উঠলেন…

কলম্বাস আনন্দিত-চিত্তে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানালেন···অতীতের ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি সেই বিরাট জয়-গৌরবের মধ্যে নিমেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল···

ইতিমধ্যে সেই দেশের লোকেরা শ্বেতচর্ম্ম এই অদ্ভুত লোকদের ক্রিয়াকাণ্ড দূর থেকে দেখছিল। যেহেতু কলম্বাসের ধারণা হয়েছিল যে তিনি ইণ্ডিয়ার মাটিতে এসে পড়েছেন, সেহেতু সেখানকার লোকদের তাঁরা Indian বলে পরিচয় দিতে লাগলেন এবং কলম্বাসের এই ভুল ইতিহাসে রয়ে গেল অক্ষয় হয়ে। আজও পর্য্যন্ত আমাদের দেশের নামে···আমেরিকার সেই আদিম অধিবাসীরা Indian বা Red-Indian নামেই পরিচিত হয়ে আসছে··· কলম্বাস যে আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করেছেন, সে-ধারণা কলম্বাসের ছিল না···

ইণ্ডিয়ানরা প্রথমে ভয়ে কাছে আসতে চায় নি··· ক্রমশ তাদের যখন ভয় ভেঙে গেল, তাদের ধারণা হলো যে, এই নবাগত লোকগুলি নিশ্চয়ই দেবতা, আকাশ থেকে ঐ ডানাওয়ালা জাহাজে করে নেমে এসেছে! কাছে এসে তারা কলম্বাসের লোকদের গায়ে হাত দিয়ে দেখে, তাদের গায়ের রঙ ও-রকম শাদা কেন!

যখন তাদের ভয় ভেঙে গেল, তারা তাদের গাছের

ফলমূল যা ছিল, সব এনে উপহার দিতে লাগলো··· কলম্বাস তাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করবার জন্যে লোকদের আদেশ দিলেন···সেই সরল আদিম অধিবাসীদের সামান্য কাঁচের গেলাস পেয়েই তখন কি আনন্দ ! ক্রমশ তাদের যখন ভয় ভেঙে গেল, তাদের সাতজন লোককে নিয়ে কলম্বাস আবার জাহাজ ছেড়ে দিলেন···

'সান্ সাল্ভাডোর্' ত্যাগ করে তাঁরা ক্রমশ ছোট-ছোট বহু দ্বীপের মধ্যে এসে পড়লেন, কিউবা, হাইতি···যখন কলম্বাস এই সব দ্বীপ পরিভ্রমণ করছিলেন, সেই সময় পিন্টার ক্যাপ্টেন পিন্জোন একদিন রাত্রির অন্ধকারে তাঁর জাহাজ নিয়ে সরে পড়লেন···

কলম্বাসের জয়ে তাঁর মনে এক দুরাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল···কলম্বাসের কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন, এই সব দ্বীপের কাছাকাছি কোন জায়গায় সোনার পাহাড় আছে···কলম্বাসও সেই সোনার দেশের সন্ধানে ঘুরছিলেন···পিন্জোন ভাবলো, সে নিজেই সে দেশের সন্ধান বার করবে এবং কলম্বাসের আগে দেশে ফিরে গিয়ে এই অভিযানের কৃতিত্ব সে সমস্তই নিজে নেবে···দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সে পথহারা হয়ে পড়ে, তাহলে সে বলবে যে রাত্রির অন্ধকারের মত পথ হারিয়ে

সে একলা চলে যেতে বাধ্য হয়। এই মতলব করে সে দল ছেড়ে পিন্‌টাকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

কলম্বাস কিউবা, হাইতি এবং আশে-পাশের সমস্ত দ্বীপ পরিভ্রমণ করে তাঁর কল্পিত সোনার খনির সন্ধান কোথাও পেলেন না বটে, কিন্তু তিনি এত অপর্য্যাপ্ত নতুন ধরণের গাছ-গাছড়া, ফল-ফুল এবং জীব-জন্তু দেখলেন যে, তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইলো না। এই অভিযানেই তিনি প্রথম দেখলেন যে, এই সব দ্বীপের অধিবাসীরা কি একরকম গাছের পাতা পুড়িয়ে তার ধোঁয়াটা খাচ্ছে... কলম্বাস বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সেই বিচিত্র গাছের পাতা কিছু তাঁর সঙ্গে তুলে নিলেন...এই পাতাই হলো তামাক-পাতা...কলম্বাসের সঙ্গে তামাক-পাতা এইভাবে য়ুরোপে প্রথম প্রবেশ করলো।

অবিরত পরিভ্রমণ করতে-করতে ক্রমশ জানুয়ারী মাস এসে গেল...আর বেশী বিলম্ব করলে হয়ত পিন্‌টা তাঁর আগে গিয়ে পৌঁছবে এই আশঙ্কায় কলম্বাস এতদিন পরে, আবার স্পেনের দিকে জাহাজের মুখ ঘোরালেন। ফেরবার পথে তাঁর লোকেরা যখন এক জায়গায় নেমে স্নান করছিল, সেই সময় হঠাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণের একদল লোক তাদের আক্রমণ করলো।

এ পর্য্যন্ত সেখানকার কোন লোকই তাদের কোন আক্রমণ করে নি…কিন্তু এখন যারা আক্রমণ করতে এগিয়ে এলো, সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ লোকেরা হলো নর-খাদক…বাধ্য হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কলম্বাসকে অস্ত্র ধারণ করতে হলো এবং যখন তাদের দুজন-চারজন লোক বন্দুকের গুলিতে মরে পড়ে গেল…তখন তারা আবার বনের মধ্যে পালিয়ে গেল…শ্বেতাঙ্গদের কর্ত্তৃক নতুন জগতে এই হলো প্রথম রক্তপাত…

পথে ফেরবার সময় কলম্বাস দেখলেন পিন্‌টা দূরে তাঁর সামনেই চলেছে…এমন সময় তুমুল ঝড় উঠলো… পিন্‌টার ক্যাপ্‌টেন তাঁর কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলো ; কিন্তু তখন ঝড়ের এ-রকম রুদ্র মূর্ত্তি যে তিনখানি জাহাজের একখানিরও রক্ষা পাওয়ার কোন আশাই রইলো না…

পাঁচদিন ধরে ক্রমান্বয়ে সেই ঝড় তেমনি ভয়ঙ্কর ভাবে বইতে লাগলো…কলম্বাসও যখন বুঝলেন যে, এ-যাত্রায় আর রক্ষে নেই…তখন তিনি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী, যা পথে লিখে রেখেছিলেন, একটা টিনের ক্যানাস্তারার মধ্যে পূরে, ভাল করে সীল্ করে জলে ভাসিয়ে দিলেন…তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যদি তাঁরা না বাঁচেন, হয়ত একদিন তাঁদের এই কাহিনী সভ্য জগতে গিয়ে পৌঁছুতে পারে…

কিন্তু কলম্বাসের সৌভাগ্য, দু'দিনের দিন ঝড় থামলো ...একটি প্রাণীও সেই ঝড়ে ডুবে যায় নি...তবে জাহাজ তিনখানিই ভেঙে-চুরে গিয়েছিল...কলম্বাস সেই জীর্ণ তরী নিয়ে অসহায়-ভাবে কোনমতে য়ুরোপের তট-ভূমি পর্তুগালে এসে পৌঁছলেন...

রাজকীয় অভ্যর্থনা

কলম্বাস ফিরে এসেছেন সেই সংবাদ পেয়ে রাজা জন খুব খাতির করে তাঁকে রাজ-সভায় নিয়ে এলেন এবং কলম্বাসকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে পর্ত্তুগালের নামে সেই অভিযানকে ঘোষণা করতে বল্লেন। কিন্তু কলম্বাস কোন প্রলোভনেই তাতে সম্মত হলেন না। তখন রাজা জনের সভাসদেরা কলম্বাস এবং তাঁর লোকদের বন্দী করে রাখবার পরামর্শ দিলেন; কিন্তু তার অর্থ হলো স্পেনের সঙ্গে পর্ত্তুগালের যুদ্ধ-ঘোষণা করা। রাজা জন সে প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলেন না। হতাশ হয়ে তিনি কলম্বাসকে ছেড়ে দিলেন।

সেই ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কলম্বাস তাঁর লোকজনদের নিয়ে, যে বন্দর থেকে যাত্রা করেছিলেন আবার সেই বন্দরে ফিরে এলেন। যখন তাঁর জাহাজ তীরে এসে লাগলো, তখন স্পেনের রাজার আদেশে, স্পেনের তাবৎ সম্ভ্রান্ত লোক কলম্বাসকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে তট-ভূমিতে সমবেত হয়েছিলেন···এক বিরাট রাজকীয়

অভ্যর্থনার মধ্যে বিজয়ী কলম্বাস আবার স্পেনের মাটিতে পা দিলেন…

এক নগর থেকে আর এক নগরে রাজকীয় অভ্যর্থনা নিতে-নিতে কলম্বাস বার্সিলোনা শহরে এসে উপস্থিত হলেন, সেইখানে তখন রাজা ও রাণী তাঁর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কলম্বাস যখন রাজ-সভায় প্রবেশ করলেন, তখন রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড এবং রাণী ইসাবেলা সিংহাসন থেকে উঠে এগিয়ে এসে স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা করে সম্মান দেখালেন।

কলম্বাস সেই রাজ-সভায় তাঁর অপূর্ব্ব কাহিনী বল্লেন এবং তাঁর স্বপ্ন যে সফল হয়েছে, তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালেন।

যে অটুট বিশ্বাস এবং যে অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সঙ্গে সেই মানচিত্রহীন মহাসাগর থেকে কলম্বাস ফিরে এসেছেন, সেই অপূর্ব্ব চমকপ্রদ কাহিনী তখন য়ুরোপের চারদিকে দেখতে-দেখতে ছড়িয়ে পড়লো…সঙ্গে-সঙ্গে য়ুরোপের প্রত্যেক রাজধানীতে লোকে অপূর্ব্ব বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে লাগলো…সবাই বলতে লাগলো… সমুদ্র-অভিযানের ইতিহাসে, এ-সাহস, এ-কৃতিত্বের আর তুলনা নেই…

ইংলণ্ডের রাজ-সভায় যখন এই সংবাদ পৌঁছল, তখন স্বয়ং রাজা সপ্তম হেনরী বলেছিলেন, এ আবিষ্কার মানুষের দ্বারা সম্ভব হয় নি···কলম্বাস অতি-মানব !

সকলেই তখন জানতেন যে কলম্বাস ভারতবর্ষের তট-ভূমিই দেখে এসেছেন, তাই যে-সব দ্বীপপুঞ্জ তিনি আবিষ্কার করলেন, পশ্চিম দিকে গিয়ে তাদের সন্ধান পেয়েছিলেন বলে, তাদের নাম হলো West Indies বা পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ···আজও ভূগোলে সেই সব দ্বীপপুঞ্জের ঐ নামই রয়ে গিয়েছে···

দ্বিতীয় অভিযান

স্পেনের রাজা ও রাণী কলম্বাসের প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁর আবিষ্কৃত নতুন দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করবার আয়োজনে সম্মত হলেন এবং কলম্বাস আবার দ্বিতীয় অভিযানের জন্যে প্রস্তুত হলেন।

যদিও যে-পরিমাণ সোনা তিনি আশা করেছিলেন, সে-পরিমাণ সোনা তিনি সঙ্গে আনতে পারেন নি, কিন্তু দ্বিতীয় অভিযানে তিনি আশা করলেন যে সোনার খনির আসল সন্ধান এবার তিনি নিয়ে আসতে পারবেন। সারা স্পেনের মধ্যে রাজাজ্ঞা ঘোষিত হয়ে গেল…কলম্বাস দ্বিতীয় বার অভিযানে বেরুচ্ছেন এবং এবার তাঁর সঙ্গে যাঁরা সেই নতুন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করতে চায়, তাদের নিয়ে যাওয়া হবে।

নতুন আবিষ্কারের উত্তেজনার মাথায় দলে-দলে লোক আসতে লাগলো…রাণী ইসাবেলা নিজে থেকে দ্বিতীয় অভিযানের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন…নানা জাতীয় লোক এই অভিযানে যোগদান করলো…তিনটী বড়-বড়. জাহাজ, এবং চৌদ্দটী ছোট জাহাজ লোক এবং খাদ্য-

সামগ্রী দিয়ে বোঝাই করে ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে কলম্বাস দ্বিতীয় অভিযানে বেরুলেন।

কিন্তু কলম্বাসের এত খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে একজন লোক বিশেষ উত্যক্ত হয়েছিলেন, তাঁর নাম হলো জুয়ান্ ডি ফোন্‌সেকা। তাঁরই ওপর এই অভিযানের খাদ্য-সামগ্রী জোগাড়ের ভার ছিল। গোড়া থেকেই ফোন্‌সেকা সামান্য-সামান্য ব্যাপারে যেভাবে কলম্বাসের সঙ্গে ঝগড়া করতে সুরু করেন, তাতে কলম্বাস বুঝেছিলেন যে, তিনি চলে গেলে, তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন করবার জন্যে স্পেনে অন্তত একজনও লোক রয়ে যাবে। কলম্বাস তাঁর এই অনুমানে যে একেবারেই ভুল করেন নি, খানিক পরেই তা প্রমাণিত হবে।

দ্বিতীয় অভিযানে কলম্বাস গোয়াডালুপ্ বলে একটা নতুন দ্বীপে নামলেন। দ্বীপের মধ্যে নেমে তিনি যে-দৃশ্য দেখলেন, তাতে ভয়ে ও বিস্ময়ে তিনি পাথর হয়ে গেলেন! দ্বীপের ভেতর যে-সব পাতার ঘর ছিল, দেখলেন, সেগুলি অধিকাংশই ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে, আর তার ভেতরে মানুষের মৃতদেহ পচে রয়েছে, কোথাও বা পড়ে আছে শুধু কঙ্কাল! একটা ঘরে গিয়ে দেখেন, কতকগুলো মেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে···তারাও মুমূর্ষু!

বহু অনুসন্ধানের পর তিনি জানতে পারলেন যে, প্রথম অভিযানে যে নর-ঘাতকদের দলের সঙ্গে তাঁদের দলের লোকের সংঘর্ষ হয়েছিল, এ হলো সেই ভয়ঙ্কর নরখাদক ক্যারিব্ জাতের কাণ্ড। মেয়েদের মাংস তারা খায় না... তাদের ধারণা যে, মেয়েদের মাংস নাকি হজম হয় না... তাই পুরুষদের খেয়ে ফেলে, মেয়েদের বেঁধে ফেলে রেখে যায়...বনের পশুদের খাদ্যের জন্যে...

প্রথম অভিযানে কলম্বাস যে-জায়গা থেকে ফিরে এসে-ছিলেন, সেখানকার তিনি নাম দিয়েছিলেন, 'নাভিডাড' (Navidad)। সেখানে তিনি নিজে থেকে একটী ছোট দুর্গ তৈরী করিয়েছিলেন এবং তাঁর দলের কয়েকজন লোককে তাঁর প্রতিনিধি-স্বরূপ সেই দুর্গে রেখে গিয়েছিলেন।

নাভিডাডে ফিরে এসে তিনি দেখেন যে, তাঁর দুর্গ ভেঙে চূরমার হয়ে গিয়েছে এবং যে-সব লোকদের তিনি রেখে গিয়েছিলেন, তাদের একজনও জীবিত নেই...সোনার অনুসন্ধানে তাদের মধ্যে কেউ এই দ্বীপের ভেতরে গিয়ে আর ফিরে আসে নি, কেউ বা ক্যারিবদের আক্রমণে মরে ভূত হয়ে গিয়েছে...অবশিষ্ট যারা বেঁচে ছিল, তারা মরেছে অসুখ-বিসুখের জ্বালা-যন্ত্রণায়।

কলম্বাস অন্য জায়গায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে আর একটা নতুন শহর গড়ে তুলতে চাইলেন, রাণীর নামে সেই নতুন শহরের নাম হলো ইসাবেলা...সেখানেই নতুন ঔপনিবেশিকরা সব নামলেন...নতুন উদ্যমে আবার ঘর-বাড়ী সব তৈরী হতে লাগলো...

ইসাবেলায় থাকতে-থাকতে কলম্বাস খবর পেলেন যে, সেখান থেকে প্রায় চার দিনের পথ একটা জায়গা আছে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে সোনা পাওয়া যায়। তাঁর সঙ্গে ওজেদা বলে এক দুঃসাহসিক যুবক ছিল। কলম্বাস ওজেদার ওপর সেই ভার দিলেন। ওজেদা লোকজন নিয়ে সেই সোনার সন্ধানে বেরিয়ে গেল।

ওজেদা যখন সেই দেশে গিয়ে উপস্থিত হলো, সে দেখলো, সত্যিই সেখানকার নদীর জলে স্বর্ণ-রেণু রয়েছে... কয়েক দিন সেখানে থেকে সেই স্বর্ণ-রেণু সংগ্রহ করে ওজেদা ফিরে এলো...কিন্তু ফিরে আসবার পথে ওজেদাও সেই নরখাদক ক্যারিবদের অত্যাচার দেখে এলো...

কলম্বাস স্থির করলেন যে, এই ক্যারিবদের ধ্বংস করতে না পারলে, উপনিবেশ স্থাপন করা নিরাপদ হবে না...তখন তিনি তাঁর দলের লোকদের এই নরখাদকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবার হুকুম দিলেন...

কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে উৎসাহের বশে যে-সব লোক এসেছিল, তাদের মধ্যে একটা দল ভেঙে পড়লো... তারা ভেবেছিল, তারা যেখানে যাচ্ছে, সেখানে দাঁড়ালেই পায়ে সোনার ধূলো লাগবে...কিন্তু তার বদলে তারা যখন দেখলো, অতি নিদারুণ অবস্থার মধ্যে তাদের দিন কাটাতে হচ্ছে এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে হয়ত নরখাদকদের আক্রমণে তাদের পেটে চলে যেতে হবে...তখন তারা গোপনে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো...এবং কলম্বাস যখন জাহাজের আশে-পাশে চারদিকে সোনার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় তারা স্থির করলো যে, একখানা জাহাজ নিয়ে তারা স্পেনে পালিয়ে যাবে, এবং সেখানে গিয়ে কলম্বাসের সমস্ত কথা যে ধাপ্পা তা প্রচার করবে।

তাদের আয়োজন কার্য্যকরী হবার আগেই কলম্বাস তাদের ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেলেন এবং কালবিলম্ব না করে, ষড়যন্ত্রকারী প্রত্যেককে কারারুদ্ধ করে রাখলেন। কলম্বাসের রুদ্র মূর্ত্তিতে সকলেই তখন বিষম ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে গেল।

এইভাবে বিদ্রোহীদের দমন করে কলম্বাস সঙ্গে প্রায় চারশো লোক নিয়ে ওজেদা যে জায়গায় নদীর জলে স্বর্ণ-রেণু দেখে এসেছিল, সেখানে যাত্রা করলেন। স্পেন

থেকে আসবার সময় তিনি সঙ্গে করে খনি-খাতকদের নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে এসে দেখলেন যে, নদী থেকে সোনা সংগ্রহ করতে যথেষ্ট সময় নেবে এবং তাঁর আশা হলো যে নিশ্চয়ই নদীর তীরের কাছে কোথাও মাটির নীচে সোনার খনি আছে।

একদল লোক নিয়ে তিনি স্থানে-স্থানে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করে দিলেন। সেই সময় তিনি মনে-মনে ভাবলেন, যখন এতগুলো লোককে সেখানে থাকতে হবে, তখন সর্ব্বাগ্রে সেখানে একটি দুর্গ তৈরী করা দরকার। তাই তিনি প্রথমে আগেকার মত একটা ছোট-খাটো দুর্গ তৈরী করালেন। দুর্গ তৈরী হলে তিনি সেই দুর্গের নাম দিলেন ফোর্ট সেণ্ট টমাস। তারপর ওজেদাকে সেই দুর্গের ভার দিয়ে তিনি আবার ইসাবেলায় ফিরে এলেন।

কয়েক মাস অনুপস্থিতির পরে ইসাবেলায় যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন দেখেন, সেখানে ঘোর অরাজকতা সুরু হয়ে গিয়েছে। কোথা থেকে এক বুনো জ্বর প্রায় মড়কের মত ছড়িয়ে পড়েছে। যারা অসুস্থ হয়ে শুয়ে পড়ে নি, তারা তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে, সেখানকার আদিম অধিবাসীদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার সুরু করে দিয়েছে, আর তার ফলে আদিম অধিবাসীরা যে-যার সরে পড়েছে।

কাজেই সারা দেশে তখন খাদ্যের এক দারুণ অভাব দেখা দিয়েছে।

ঐ সব অসভ্য লোকেরা নিজেরা নানা ফল-মূল আহরণ করে উপহার-স্বরূপ নিয়ে আসতো আর সামান্য কিছু চকচকে জিনিষের বিনিময়ে সেই সব খাদ্য তারা দিয়ে যেতো। এখন আর সে-সব খাদ্য তারা আনে না, কাজেই এমন অভাব!

কলম্বাস সঙ্গে করে যে-সব খাদ্য নিয়ে এসেছিলেন, তা-ও দিনের পর দিন কমে আসছিল। কলম্বাস চেষ্টায় ছিলেন, ঔপনিবেশিকদের দিয়ে চাষবাস করাবেন; কিন্তু তারা নিজেরা খাটতে না চেয়ে ইণ্ডিয়ানদের দিয়ে, সেই খাটুনী খাটিয়ে নিতে চাইছিলো...এইসব কারণে কলম্বাস দেখলেন যে ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সরল-প্রাণ সেই ইণ্ডিয়ানদের বেশ একটা শত্রুতা গড়ে উঠছে এবং তার জন্যে যোলো আনা দায়ী, তাঁরই দলের যত সব পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ সুখান্বেষী লোকজন।

কলম্বাস বুঝলেন, তারা জানেনা যে, সাত-সমুদ্র তেরো নদী পারে এসে যদি ঐশ্বর্য্য নিয়ে যেতে হয়, তাহলে নিজেদের করতে হবে পরিশ্রম, খাটাতে হবে বুদ্ধি এবং যাদের মধ্যে এসে পড়া গিয়েছে, তাদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে

হবে। কাজেই কলম্বাস সেই অলস জনতাকে শিক্ষা দেবার জন্যে আইনজারী করলেন, প্রত্যেক লোককে সেই উপনিবেশের কল্যাণের জন্যে, নিজের হাতে চাষ করতে, কিম্বা শস্য ভাঙতে, কিম্বা যা হোক কিছু পরিশ্রম করতে হবে ; যে তা করবে না, তাকে সাধারণ ভাণ্ডার থেকে খাদ্য দেওয়া হবে না।

এই আদেশে তাঁর দলের অধিকাংশ লোকই ভেতরে-ভেতরে ক্ষেপে উঠলো। তারা যখন নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করে কলম্বাসের সঙ্গে এসেছিল, তখন তাদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকমের। কলম্বাসের চরম দুর্ভাগ্য যে তিনি যে-সব লোক নিয়ে তাঁর সাধনায় নেমেছিলেন, তারা সকলেই অতি নিম্নস্তরের মানুষ। তাঁর দলে কয়েকজন পাদ্রীও এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ফাদার বয়েল্ বলে একজন পাদ্রী কলম্বাসের এই আদেশ শুনে প্রতিবাদ করে জানালেন যে তাঁরা পাদ্রী, তাঁরা মাটি খুঁড়তে আসেন নি, তাঁদের কাজ হলো উচ্চস্তরের।

কলম্বাস তাঁর কথা শুনলেন কিন্তু পাদ্রাদের একেবারে কাজ করা থেকে তিনি রেহাই দিলেন না। পাদ্রীদের বেলায় তিনি শাস্তির বিধান করলেন, যদি তাঁরা পরিশ্রম না করেন তাহলে শুধু একবেলার মত খাদ্য পাবেন।

কলম্বাসের এই বিধানের ফলে সেই উপনিবেশের অধিকাংশ লোকই তাঁর শত্রু হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু তাঁর তখন সেদিকে ভ্রূক্ষেপই ছিল না। তাঁর মাথায় তখন পৃথিবীর মানচিত্র রাত-দিন ঘুরছিল! তিনি ভাবছিলেন, আরো কত নতুন দেশ আছে, অথচ সেখানে এখনো তিনি পৌঁছতে পারেন নি···যে ভারতবর্ষের কথা তিনি লোক-মুখে, ইতিকথায় শুনেছেন, সেখানকার অন্তর্দেশে তিনি শুনেছেন, বড়-বড় রাজারা আছেন···পশ্চিমের অগ্রদূত হয়ে সেখানে তাঁকে পৌঁছতে হবে···যে সোনা-মণি-মরকতের কথা তিনি রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড এবং রাণী ইসাবেলাকে শুনিয়ে এসেছেন, এখনো সে দেশে তিনি পৌঁছতে পারেন নি—তাই তাঁর মাথায় তখন রাত-দিন ঘুরছিল, নব-নব দেশের চিত্র, নব-নব তট-ভূমির স্বপ্ন···তাই কোথায় কার মনে কি হচ্ছে, সে চিন্তাই তাঁর ছিল না···যাঁকে রাজা বলে স্বীকার করেছেন, তাঁর সামনে যে বিরাট স্বপ্ন তিনি তুলে ধরেছেন, তাকে সফল করতেই হবে। কিন্তু হায়, তখন কলম্বাসের মনে কোন ধারণাই ছিল না যে, মানুষের হাতে কি কঠিন আঘাত তাঁর জন্যে অদূর ভবিষ্যতে অপেক্ষা করছিল!

তিনি স্থির করলেন, ইসাবেলায় বসে না থেকে তিনি নতুন দেশ আবিষ্কারের জন্যে বেরুবেন। তাঁর অবর্ত্তমানে

সেই নব-গঠিত নগরীর শাসনের ভার তিনি কয়েকজন লোকের মিলিত এক কাউন্সিলের ওপর দিলেন এবং সে কাউন্সিলের সভাপতি করে গেলেন তাঁর ছেলে দিয়িগোকে।

ওজেদার ওপর ভার রইলো ফোর্ট সেণ্ট টমাসের এবং মারগারিট নামে তাঁর আর একজন সাহসী কর্ম্মচারীর ওপর সেখানকার আশে-পাশের স্থলভূমি তদারক করে সোনার খনির সন্ধান করবার ভার দিলেন। এইভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করে, তিনি জাহাজ নিয়ে আবার জলে ভাসলেন।

কুৎসিত ষড়যন্ত্র

কয়েক মাস সমুদ্রে ব্যর্থভাবে ঘুরে তিনি যখন ইসাবেলায় ফিরে এলেন তখন দেখেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।

কলম্বাস সঙ্গে করে যে সব সৈনিক এনেছিলেন, মারগারিট ছিলেন তাঁদের নায়ক। কলম্বাসের অনুপস্থিতিতে ফাদার বয়েলের প্ররোচনায়, তিনি তাঁর লোকজন নিয়ে দিয়িগোর বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভিযানের আয়োজন করেন। কলম্বাসের ভাই বার্থলোমিউ যথাসময়ে সেই বিদ্রোহের খবর জানতে পেরে মারগারিটকে প্রতিরোধ করবার জন্যে প্রস্তুত হন।

মারগারিট জানতো যে বার্থলোমিউ কলম্বাসের মতই সাহসী এবং বীর...তাই তিনি ইসাবেলা আক্রমণ না করে, বন্দরে তাঁদের দলের যে-সব জাহাজ ছিল, তাই নিয়ে স্পেনের অভিমুখে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য—স্পেনে ফিরে গিয়ে, কলম্বাসের সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করে রাজ-অনুগ্রহ থেকে কলম্বাসকে বঞ্চিত করা। আর একদিকে নর-খাদকদের নেতা ক্যানাবো তাঁর লোকজন নিয়ে ফোর্ট সেণ্ট

টম্যাস অবরোধ করলো। দিনের পর দিন সেই নরখাদকদের সঙ্গে অবরুদ্ধ স্পেনিয়ার্ডদের যুদ্ধ চলতে লাগলো। স্পেনিয়ার্ডদের সুবিধা ছিল যে, তাদের হাতে ছিল বন্দুক। ক্যানাবো যখন দেখলো যে বন্দুকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ-রকম যুদ্ধে তার লোকেরা জিততে পারে না, সে তখন তার লোকজন নিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করলো। মারগারিট চলে যাওয়াতে তাঁর দলের সৈন্যরা নায়ক-শূন্য হয়ে নিরীহ ইণ্ডিয়ানদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার সুরু করে দিল। এহেন অবস্থায় কলম্বাস ইসাবেলায় ফিরে এলেন।

স্পেনে ফিরে গিয়ে, মারগারিট ও ফাদার বয়েল সেই বিদেশী ইতালীয়ানের নামে ভয়ঙ্কর সব কুৎসা রটনা করতে লাগলেন এবং সে-ব্যাপারে তাঁরা ফোন্‌সেকার দলের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেলেন। তাঁদের চেষ্টার ফলে রাজা ও রাণীর কাছেও এই সব কুৎসা গিয়ে উঠলো।

কলম্বাস যে স্বর্ণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তা পাঠাতে পারেন নি। সেই জন্যে রাজা ও রাণীর মন ইতিমধ্যেই ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল। তারপর যখন তাঁরা শুনলেন যে, কলম্বাস সেখানকার লোকদের ওপর ভয়ঙ্কর নির্য্যাতন করছেন এবং নিজের জন্যে কলসী-কলসী সোনা সঞ্চয় করে রাখছেন, তখন রাজা ও রাণীর মন তিক্ত হয়ে

উঠলো। তাঁরা অপর পক্ষের কথা শোনবার আগেই নিজেদের মনে কলম্বাস-সম্বন্ধে বিরূপ হয়ে রইলেন; এবং কলম্বাসের গতিবিধি ও কাজ সম্বন্ধে নিজের চোখে দেখে রিপোর্ট করবার জন্যে তাঁরা তাঁদের একজন বিশ্বস্ত উচ্চ রাজকর্ম্মচারীকে পাঠালেন।

সমুদ্র-তরঙ্গে বিপর্য্যস্ত হয়ে সেই রাজকর্ম্মচারী যখন ইসাবেলায় গিয়ে পৌঁছুলেন, তখন ইসাবেলার চারদিকে গোলমাল। সেই গোলমালের মধ্যে তিনি কলম্বাসের ওপর হুকুম জারী করতে লাগলেন এবং তাঁর প্রত্যেক কাজে সন্দেহ করে তাঁকে বাধা দিতে লাগলেন। ক্রমশ ব্যাপার এমনি হয়ে এলো যে, কলম্বাস নিজে ফিরে এসে রাজা ও রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে স্পেনের অভিমুখে রওনা হলেন।

কলম্বাস ফিরে এলেন; কিন্তু এবার যখন কলম্বাস ফিরে এলেন, তখন আর তাঁকে অভিনন্দন করতে তট-ভূমিতে উন্মাদ জনতা চীৎকার করে উঠলো না, নগরে-নগরে অভিনন্দনের জন্যে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হলো না। সাধারণ লোক উত্তেজনা চায়, তারা দিনের পর দিনের অধ্যবসায়, অন্তরের নিভৃত নিষ্ঠা, এসব জিনিসকে অভিনন্দন করতে সহসা চায় না। তার ওপর কলম্বাসের

শত্রুপক্ষ যে-সব কুৎসা রটিয়েছিল, তা তারা ষোলো আনাই বিশ্বাস করে নিয়েছিল।

পরের নিন্দার চেয়ে মুখরোচক জিনিস, সাধারণ মানুষের কাছে আর কিছু নেই। কাল যাকে তারা দেবতা-জ্ঞানে পূজা দিয়েছে, আজ তার নামে জঘন্যতম কুৎসা রটনা করে; বিচার করে দেখবার ধৈর্য্যটুকু পর্য্যন্ত তাদের থাকে না।

রাজসভায় রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ও রাণী ইসাবেলা তাঁকে সমাদর করলেন বটে কিন্তু সে সমাদরের মধ্যে তেমন কোন প্রাণের উত্তাপ ছিল না। রাজসভা থেকে কলম্বাস শুনলেন, গুঞ্জনধ্বনি হচ্ছে, যার মর্ম্ম হচ্ছে, কলম্বাস এমন কি আর করেছে…তারা ইচ্ছে করলে সবাই তা করতে পারতো!

কলম্বাসকে সম্মান দেখাবার জন্য একটা ভোজের আয়োজন হলো বটে, কিন্তু তাও যেন প্রাণশূন্য! কলম্বাস লক্ষ্য করলেন, ভোজে আয়োজনের অভাব নেই… সমারোহের অভাব নেই…অজস্র প্রাচুর্য্য চারদিকে উপ্‌ছে পড়ছে…তবু তাতে আন্তরিকতার অভাব! বরং এমন দু'চারটি কথাবার্ত্তা তাঁর কানে এলো, যা তাঁর কাছে জঘন্য বিদ্রূপ বলেই মনে হলো!

তিনি শুন্‌লেন, নিমন্ত্রিত সভাসদ্‌রা পরস্পর কথাবার্ত্তা বলছেন...তাঁদের একজন বল্লেন, কলম্বাস কি এমন একটা কাজ করেছে যার জন্য এত সমারোহ! অপর একজন তার জবাব দিলেন...সে আর বলো কেন ভাই? এ যেন কত বড় একটা আবিষ্কার! জীবনে সাগর-জলে ভাসেনি, এমন লোক কোথাও আছে নাকি! তুমি না হয় গিয়েছ দশ মাইল, আমি গিয়েছি বিশ মাইল, কেউ বা গিয়েছে পঁচিশ মাইল! যা শুধু এই মাইলের পার্থক্য। তা ছাড়া এতে আর বাহাদুরীটা কোথায়? কলম্বাস নয় কিছুটা বেশী পথই সাগর-জলে গিয়েছিল! চেষ্টা করলে...হয়তো তুমিও পারতে...আমিও পারতাম...আর কোনো লোকও পারতো।

কলম্বাস তাঁদের কথাবার্ত্তা শুন্‌লেন...শুনে বুঝতে পারলেন কথার স্রোত বইছে কোন্‌দিকে! তিনি তার কোনো প্রতিবাদ করলেন না, ডিশ্‌ থেকে একটী ডিম তুলে নিয়ে বল্লেন, বন্ধুগণ! আপনারা কেউ এই ডিমটাকে ডিশের ওপর দাঁড় করাতে পারেন?

সভাসদ্‌রা একে-একে সকলেই চেষ্টা করলেন...কিন্তু তাঁদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো...কেউ সেটি দাঁড় করাতে পারলেন না।

তখন কলম্বাস বল্লেন, দিন, এখন ডিমটা আমায় দিন। …এই বলে সেটী হাতে নিয়ে তার একটা দিক্ টেবিলে ঠুকে দিলেন।…ঠুক্তেই ডিমের সেই দিকের খোলসটা ভেঙে গেল…তারপর সামান্য চেষ্টা করতেই ডিমটীকে সেই মাথার ওপর দাঁড় করানো গেল।

সবাই প্রতিবাদ তুল্লেন, 'ওরকম ভাবে সবাই পারে… আমরাও পারতুম। কলম্বাস বল্লেন, হঁা পারতেন আপনারা সবাই…কিন্তু যদি আপনাদের মাথায় এ বুদ্ধিটুকু খেলতো! মাথায় খেলা নিয়েই হচ্ছে যত পার্থক্য, তাছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। আপনাদের মাথায় যদি খেলতো, তাহলে আপনারাও নতুন জগৎ আবিষ্কার করতে পারতেন!

উপস্থিত সভাসদ্রা কলম্বাসের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করতে পেরে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।

কিন্তু হিংসুক যারা…পরশ্রীকাতর যারা, তর্ক করে তো তাদের হৃদয় জয় করা যায় না! কলম্বাস সর্ব্বত্রই একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পেতে লাগলেন।

ক্রমশ তাঁর মন ভেঙে পড়লো। তিনি অবশ্য অভিনন্দন নেবার জন্যে আসেন নি। যে কাজ তিনি সুরু করেছিলেন, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আরো অর্থের প্রয়োজন, আরো লোকের প্রয়োজন, তাই তিনি

আবার ফার্ডিন্যাণ্ড এবং ইসাবেলার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বার-বার আবেদন সত্ত্বেও, কলম্বাস তাঁদের কাছ থেকে কোন উত্তর পেলেন না।

উত্তরের অপেক্ষায় দুটী বছর কেটে গেল, অবশেষে রাণী ইসাবেলার মনে কলম্বাস রেখাপাত করতে পারলেন। রাণী ইসাবেলাকে তিনি বোঝাতে পারলেন যে, কলসী-কলসী কাঁচা সোনা না নিয়ে আসতে পারলেও, যে সব নতুন রাজ্য তিনি স্পেনের হয়ে অধিকার করেছেন এবং করবেন, তাতে সাম্রাজ্য হিসেবে স্পেনের গৌরব এবং শক্তি বাড়বে বই কমবে না।

রাণী ইসাবেলা সন্তুষ্ট হয়ে আবার অভিযানের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু এবার অভিযানে লোক আর পাওয়া যায় না ; কারণ, ইতিমধ্যে কুৎসার ফলে সুদূর উপনিবেশ সম্বন্ধে যে-সব কাহিনী প্রচারিত হয়েছিল, তাতে কোন লোকই আর ঘরের মায়া ত্যাগ করে যেতে চাইলো না। অবশেষে জেল থেকে কয়েদীদের জোর করে কলম্বাসের সঙ্গে পাঠানো হলো।

তৃতীয় অভিযান ও লাঞ্ছনা

১৪৯৮ সালে কলম্বাস তৃতীয় অভিযানে বেরুলেন। এবার তাঁর প্রধান আবিষ্কার হলো দক্ষিণ-আমেরিকার মূলভূমি। প্রধানতঃ এতকাল তিনি কতকগুলো দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেই তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এবার তাঁর মনে হলো—না তা নয়…নতুন জগৎ কেবল এই নিয়েই সীমাবদ্ধ হতে পারে না…না জানি কোন্ এক অজানা জগৎ তার বিস্তৃত অবয়ব ও অনন্ত রহস্য নিয়ে কোথায় লুকিয়ে রয়েছে!

কলম্বাসের যত্ন ও সাধনায় তাঁর অন্তরের সেই বিরাট ভবিষ্যৎ সত্যরূপে প্রকটিত হয়ে উঠ্‌লো…নূতন জগতের মূলভূমি যথার্থই একদিন তাঁর চোখে বাস্তবের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে…কত অলৌকিক রহস্যের ভাণ্ডার নিয়ে, তাঁর চোখের সুমুখে এসে ধরা দিলে! কলম্বাস এবার আবিষ্কার করলেন দক্ষিণ-আমেরিকা…দক্ষিণ-আমেরিকার নিকটবর্ত্তী কোন দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ নয়…দক্ষিণ-আমেরিকার মূলভূমি!

এই তৃতীয় অভিযানের শেষভাগে কলম্বাস যখন ইসাবেলায় এসে পৌঁছলেন, তখন সেখানকার অবস্থা দেখে তাঁর মন একেবারে ভেঙে পড়লো। রোলডান্ বলে

একজন লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করে কলম্বাসের জায়গায় নিজেকেই 'ভাইস্‌রয়' বা রাজ-প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছে···তার অত্যাচারে তখন চারদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে···কলম্বাসকে ফিরে আসতে দেখে রোলডান্‌ প্রকাশ্য ভাবে তাঁকে অপমান করতে সুরু করে দিল··· বিরক্ত হয়ে অধিকাংশ লোক তখন স্পেনে ফিরে গিয়েছিল এবং স্পেনে ফিরে এসে তারা সব দোষ কলম্বাসের ঘাড়ে চাপিয়ে, সমস্ত ব্যাপারকে উপহাসযোগ্য বলে প্রচার করতে লাগলো।

রাণী ইসাবেলা বিরক্ত হয়ে ফ্রান্‌সিস্‌ বোবাডিলা নামে তাঁর নিজের একজন লোককে রাজ-প্রতিনিধি করে পাঠালেন ; তাঁর ওপর তিনি ক্ষমতা দিলেন যে, যদি তিনি দেখেন যে কলম্বাস সত্যিই অপরাধী, সেই দণ্ডে সেইখানে তাঁকে শাস্তি দিতে···

জগৎ এই ভাবে বার-বার ভুল করে এসেছে···যার কাছ থেকে সে উপকৃত হয়েছে, তাকেই সে লাঞ্ছনা দিয়ে মেরে ফেলেছে···

স্পেন ত্যাগ করবার আগেই বোবাডিলা জানতেন, কলম্বাস সম্বন্ধে তিনি কি করবেন ; কারণ, কলম্বাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন নেতা।

ইসাবেলায় উপস্থিত হয়েই সেখানকার অরাজক অবস্থা দেখে তিনি তৎক্ষণাৎ কলম্বাসকে বন্দী করলেন এবং যে বীরপুরুষ তাঁর স্পেনের হাতে অর্দ্ধ-পৃথিবীর সংবাদ এনে দিয়েছিল, শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁকে স্পেনে বন্দী করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো…

আজীবন রূঢ় সংগ্রামের শেষে এই নিষ্ঠুরতম পুরস্কারে কলম্বাস একেবারে ভেঙে পড়লেন…রাণী ইসাবেলার সামনে যখন তাঁকে উপস্থিত করা হলো, তাঁর আর সে চেহারা তখন নেই…এই নিদারুণ অপমানের আঘাতে তাঁর সারা দেহে অকাল বার্দ্ধক্য নেমে এসেছে…মুখের সে দীপ্তি নেই…

রাণী ইসাবেলা দেখলেন, বৃদ্ধ জরাজীর্ণ কলম্বাসের চোখে জল! তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভাবে অভিভূত হয়ে তিনি নিজের হাতে কলম্বাসের শৃঙ্খল খুলে দিলেন…

তারপর কলম্বাসের সমস্ত কাহিনী শুনে রাণী ইসাবেলা বুঝলেন যে, কলম্বাসের বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত্র চলছে …সেই মুহূর্ত্তে তিনি বোবাডিলাকে শাস্তি দেবার জন্যে লোক পাঠালেন এবং কলম্বাসকে আবার চতুর্থ অভিযানে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

চতুর্থ অভিযান

কলম্বাস চতুর্থ অভিযানে বেরিয়ে কিছুকাল মেক্সিকো-উপসাগরের দক্ষিণ দিক্ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন… আবিষ্কারের মায়াজালে অজানা নূতন জগতের কত অজ্ঞাত রহস্য ধরা পড়তে লাগলো!

তারপর তিনি তীরে নেমে দেখ্লেন, উপনিবেশ স্থাপন করবার সমস্ত চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন মাত্র স্পেনিয়ার্ডকে নিয়ে তাঁর ছেলে দিয়িগো তখনো পিতার অপেক্ষায় বসে ছিল…চারিদিকে ইণ্ডিয়ানরা স্পেনিয়ার্ডদের যথেচ্ছ ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে আর তাদের সঙ্গে মিত্রতা করার কোন প্রয়োজন অনুভব করে না…

কলম্বাস দেখলেন, খাদ্যের অভাবে তাঁদের মারা পড়তে হবে…যদি ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে আবার সদ্ভাব ফিরিয়ে না আনতে পারেন। এই সময় এক অভিযানে জ্যামাইকার তীরে ভগ্ন-তরী অবস্থায় কোন রকমে সাঁতার দিয়ে তিনি জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, কোন সাহায্যের কোন চিহ্ন নাই!

অবশেষে যখন উপবাসে দেহ প্রায় মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে, সেই সময় তাঁর ছেলে তাঁকে সেই অবস্থা হতে উদ্ধার করে স্পেনে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

কলম্বাস আবার স্পেনে ফিরে এলেন···কিন্তু কোথায় সে অভিনন্দন, কোথায় সে মালা-চন্দন !

সকলের চেয়ে দুঃখের বিষয়, কলম্বাস ফিরে এসে শুনলেন যে রাণী ইসাবেলা পরলোক গমন করেছেন ! তখন তাঁর আর কোন আশাই রইলো না। রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ক্রমশ-ক্রমশ কলম্বাসকে একেবারে ভুলেই গেলোন।

কলম্বাস যে-সব রাজ্য আবিষ্কার করেছিলেন, সেখানে স্পেনের রাজদণ্ড তখন পূরোমাত্রায় গিয়ে পৌঁছিয়েছে ; কিন্তু হায় হতভাগ্য বৃদ্ধ কলম্বাসের সংবাদ নেওয়া আর তখন কেউ প্রয়োজনীয় মনে করে না···রাণী ইসাবেলা তাঁর যে মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন, অবহেলায় তা-ও ক্রমশ বন্ধ হয়ে গেল···

তার ফলে পৃথিবীতে···সুসভ্য য়ুরোপ···সেদিন যে কৃতঘ্ন বায়ুর তপ্ত প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল, সে কথা মনে হলে আজও শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায় !

যে লোক অর্দ্ধ-পৃথিবীর সংবাদ এনে দিল, সেই লোকই

গায়ে হাত দিয়ে দেখল, তাদের গায়ের রঙ ওরকম শাদা কেন ?

সেদিন স্পেনের রাজপথে ভিখারীর মতন ঘুরে বেড়িয়ে-ছিল…থাকবার জন্যে তার মাথার ওপর একটা ছাদ জোটে নি…খাদ্যের অভাবে তাকে সেদিন এক সরাইখানা থেকে আর এক সরাইখানায় ভিক্ষা করে বেড়াতে হয়েছে…

রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড সেদিন কলম্বাসের দিকে ফিরেও চান নি…

এই ভাবে নিদারুণ অবজ্ঞা আর দারিদ্র্যের মধ্যে কলম্বাস ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে শেষবারের মত এমন এক মহা অভিযানে বেরোলেন, যে-অভিযান থেকে কোন মানুষই আর কোনদিন ফিরে আসে না।

তিরোধানের পরে

১৫০৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে, জগতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। নূতন জগতের আবিষ্কারক ক্রিষ্টোফার কলম্বাস সেদিন শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে…ভগ্ন হৃদয়ে…স্পেনের ভ্যালাডলিড্ (Valladolid) শহরে কবর-তলায় তাঁর শেষ বিশ্রাম খুঁজে নিলেন !

আবিষ্কারের নেশায় উন্মত্ত হয়ে…নানা দুঃখ-বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়ে…মাটির পৃথিবীর এক নগণ্য সন্তান…১৪৯২ সাল হতে যিনি কেবলই সাগর-দোলায় দোল খেতে-খেতে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তারপর কৃতঘ্ন মানুষ যাঁকে আঘাতের পর আঘাত হেনে মর্ম্মন্তুদ ব্যথা-বেদনায় জর্জ্জরিত করে ফেলেছিল, অবশেষে অভাব ও অনাহার যাঁকে চিরসঙ্গী করে আঁকড়ে ধরেছিল,…সেই হতভাগ্য কলম্বাসের এতদিনে হলো চিরমুক্তি !

কোনো সম্রাট্ বা সম্রাজ্ঞীর অনুগ্রহ বা নিগ্রহ…স্বদেশবাসী বা স্বজাতীয়গণের ব্যঙ্গ বা ভ্রূকুটি…কিংবা অভাব ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ বা অনাহারের আতঙ্ক—সমস্তই আজ তাঁর কবরের বাইরে পড়ে রইলো…নিরুপদ্রব কলম্বাস তাঁর শেষ-শয্যায় শান্তিতে শুয়ে রইলেন।

কলম্বাসের অমর আত্মা শান্তিতে রইলো বটে, কিন্তু পৃথিবী ?···তাঁর স্বদেশ ?······স্বজাতি ?······তারা কেউ শান্তিতে রইতে পারলো কি ?—না। পৃথিবীর জ্ঞানের ভাণ্ডার যিনি বাড়িয়ে গেলেন···পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য যিনি বাড়িয়ে গেছেন···মানুষের দৃষ্টিকে যিনি অনন্ত সাগরের অপর তীর পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন,···তাঁকে যারা উপযুক্ত মর্য্যাদা দানে কুণ্ঠিত হয়েছে,···শান্তি তাদের পক্ষে অসম্ভব! কাজেই কলম্বাসের মৃত্যুর পর···তাঁর সমাধি-লাভের পর···নিয়তির চক্রে ঘুরে এলো পৃথিবীর হিসাব-নিকাশের দিন।

জগৎ সেদিন তার ভুল বুঝতে পারলো···জগতের কাছে কলম্বাস যে কি অসীম লাঞ্ছনাই সহ্য করেছেন, তাই ভেবে সারা জগৎ শিউরে উঠ্‌লো···কাজেই তখন থেকেই সুরু হলো অনুতাপ ও অনুশোচনার মূর্ত্ত বিকাশ! তার আতিশয্যে কলম্বাসকে জগৎ তাঁর নীরব নিভৃত কবরের নীচেও স্থির থাকতে দিলে না···কবর খুঁড়ে তাঁর দেহাবশিষ্ট বার করা হলো···তারপর ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে অধিকতর সমারোহের সঙ্গে তাঁকে কবরে আবার সমাহিত করা হলো স্পেনের 'সেভাইলী' (Seville) শহরে।

এরপর ২০।২২ বছর বেশ নিরুপদ্রবেই কেটে গেল।

স্পেনের রাজদণ্ড···পুরানো পৃথিবীর প্রভুত্ব···তখন নতুন জগতের অণু-পরমাণুতে কায়েমী হয়ে বসে যাচ্ছিল। স্পেন—তথা সারা য়ুরোপ, তখন আর কলম্বাসকে মর্য্যাদা দিতে কৃপণতা করতে পারে না···কারণ নতুন জগতের ঐশ্বর্য্য, নতুন জগতের পরিচয়···তাদের চোখের কাছে তখন এক নতুন সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে!

ওদিকে···পশ্চিমে নতুন জগৎও বুঝতে পেরেছে···কোথায় তারা ছিল, আর কোথায় তারা এসেছে! অপাংক্তেয় লোকের মত···ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর···ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র অধিবাসী হয়ে···তারা ঘৃণিত জীবন অতিবাহিত করছিলো, কিন্তু আজ তারা এক বিশাল পৃথিবীর অধিবাসী···সকলেই সমান মর্য্যাদার অধিকারী!

পূর্ব্ব ও পশ্চিম···উভয়েরই মনে একসঙ্গে প্রশ্ন জেগে উঠ্‌লো···কে, কে এর মূল কারণ? পূর্ব্বের পুরানো জগৎ আর পশ্চিমের নতুন জগৎকে আজ সমসূত্রে···এক পংক্তিতে এনে দাঁড় করালেন কে? কৃতজ্ঞ চিত্তে সবাই অনুভব করলো—তিনি কলম্বাস!

কাজেই অনুভবের সাথে-সাথে আবার এলো তার অভিব্যক্তি! কিন্তু এবার সাড়া দিলে পশ্চিমের নতুন জগৎ। পশ্চিমের···নতুন জগতের এক অংশ···কলম্বাস

যাকে স্পেনের অনুকরণে নাম দিয়েছিলেন 'হিস্পেনিয়োলা' অর্থাৎ 'ছোট স্পেন' (—অধুনা পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের 'হাইতী' দ্বীপের অন্তর্গত), সেইখান থেকে দাবী এলো... আবিষ্কারক কলম্বাসের দেহাস্থি সেইখানে তারা সমাহিত করবে।

তাই হলো। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস ও তাঁর ছেলের দেহাস্থি হিস্পেনিয়োলার স্যাণ্টো ডোমিঙ্গোতে স্থানান্তরিত করা হলো।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে...১৪৯২ সালে...যে দেশের ভূঁয়ে কলম্বাস প্রথম পদার্পণ করেছিলেন, আজ সেখানেই তাঁর অমর আত্মা শান্তিতে বিশ্রাম করতে লাগলো। প্রথম পদার্পণের দিন তাঁর যে অনুভূতি হয়েছিল...আশা-আকাঙ্ক্ষার যে উন্মাদনা সেদিন তাঁর বুকের ভিতর মহা আন্দোলন তুলেছিল, দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পরে সেদেশের জল-হাওয়ার ছোঁয়াচ্ লেগে, তাঁর ক্লান্ত আত্মা সেদিনও কোন অনুভূতিতে নড়ে উঠেছিল কিনা কে জানে ?

কত গৌরব আজ কলম্বাসের ?...অনাবিষ্কৃত অপরিচিত পৃথিবীর এক নূতন দেশ...তাঁরই আবিষ্কৃত লীলাভূমি হিস্পেনিয়োলায়...অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর লাঞ্ছিত সন্তান

আবিষ্কারক কলম্বাস···শান্তিতে চির-নিদ্রিত! এতদিনে বুঝি সত্যই প্রমাণিত হলো···কলম্বাসের কৃতিত্ব ও সম্মান আজ সবাই বুঝতে পেরেছে···নূতন ও পুরাতন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই উঠ্‌লো কলম্বাসের জয়-জয়কার!

সুদীর্ঘ আড়াই শ' বছর এমনি ভাবে কেটে গেল। নূতন জগতের ধনৈশ্বর্য্য, নূতন জগতের জীব-জন্তু ও সম্পদ তখন পুরানো পৃথিবীর—বিশেষতঃ য়ুরোপের বুকে কত আশার আলোর রঙিন স্পন্দন জাগিয়ে তুলছিল!···ভাবের আবেশে কলম্বাসের বিজয়-বৈজয়ন্তী ক্রমশ সকলেই অভিভূত হয়ে মেনে নিচ্ছিল! কলম্বাসের নাম ও ছোঁয়াচ্ পেতে সকলেই যেন লোলুপ হয়ে ওঠে! পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম দ্বীপ-ভূমি 'কিউবার' বুকে তেমনি একটা আলোড়ন উপস্থিত হলো।

তারই ফলে···আড়াই শ' বছরেরও কিছু বেশী দিন পরে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে···কলম্বাসের সুপ্ত আত্মার হলো আবার এক নূতন জাগরণ!···নিদ্রিত কলম্বাসের দেহাস্থি ···আবার নূতন ভাবে সমাহিত করা হলো···কিউবার 'হ্যাভানা' শহর হলো এবারকার সমাধি-ভূমি।

এর কিছুকাল পর···কিউবা এক ভয়ানক যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়লো···তার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া যুদ্ধের ধূমে

পঙ্কিল ও বিষাক্ত হয়ে উঠলো···শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি কোন্ অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল !

তারপর লড়াই যখন শেষ হয়ে গেল···তখন সুরু হলো আবার এক নূতন উদ্দীপনা ! পুরানো পৃথিবীর য়ুরোপ··· বিশেষতঃ স্পেন···নূতন করে অনুভব করলো···কলম্বাস তো ছিলেন আমাদেরই একজন ! আমাদেরই দেশের রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড আর রাণী ইসাবেলার সাহায্যেই তো কলম্বাস তাঁর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে···এক নূতন জগৎ আবিষ্কারে উন্মাদের মত বেরিয়ে পড়েছিলেন !···কাজেই কলম্বাসের আবিষ্কার···সে তো আমাদেরই আবিষ্কার··· স্পেনের আবিষ্কার ! কলম্বাসের বিজয়···সে আমাদেরই বিজয়···স্পেনের বিজয় ! কলম্বাস নিজেও তা মেনে নিয়েছিলেন···আর তা মেনে নিয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত ভূমির এক অংশের নামও দিয়েছিলেন 'হিস্পেনোলিয়া' বা ছোট স্পেন।···তাহ'লে তাঁর দেহ সমাহিত করবার যে গৌরব···সে গৌরবে স্পেনের দাবী হচ্ছে সর্ব্বাগ্রে।

কাজেই···স্পেন স্থির করলো···কলম্বাসের দেহাস্থি তারা নিয়ে আসবে স্পেনে···তারপর আবার তাঁকে নূতন করে কবর দেওয়া হবে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে···অর্থাৎ হ্যাভানায় প্রোথিত হবার প্রায় একশ' বছর পরে···হ্যাভানার কবর-দুয়ার আবার একবার খোলা হলো···তারপর মহাসমারোহে তাঁর দেহাস্থি নিয়ে আসা হলো স্পেনের গ্র্যানাডা শহরে।

গ্র্যানাডার কবর-তলায়ই কলম্বাস শুয়ে রইলেন কয়েক বছর···তারপর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে···শেষবারের মত আর-একবার তাঁর সুনিদ্রায় ব্যাঘাত করা হলো···তাঁর দেহাস্থি নিয়ে আসা হলো স্পেনের সেভাইলী শহরে!

সেখানে সুন্দর এক স্মৃতি-মন্দির···অমর আবিষ্কারক কলম্বাসের দেহাস্থি ধারণ করবার মত সুবিস্তৃত—সমুন্নত; মায়ের মত পরম স্নেহে···সে মন্দির কলম্বাসের পুণ্যাস্থি বুকে নিয়ে···আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে!

আকাশে সূর্য্য নিশ্চল···মর্ত্ত্যে নিশ্চল কত অভ্রভেদী পর্ব্বতরাজি! তেমনি সারা বিশ্বে আজ নিশ্চল সেই অমর-কীর্ত্তি কলম্বাসের যশোরাশি! পৃথিবীর জীবনে কোনোদিনই সে যশ ক্ষুণ্ণ হবে না—হতে পারে না··· সে যশ অমর···অক্ষয়।

চরিত্র-সমালোচনা

ক্রিস্টোফার কলম্বাসের তিরোধানের পর···প্রায় সাড়ে চারশ' বছর পেরিয়ে গেছে···তবু আজও তাঁর বিজয়-কেতন জগতের চোখে সমুদ্ভাসিত হয়ে আছে।

কিন্তু মানব-চোখের এই হলো একটা দিক্ মাত্র। যাঁরা এ-দিক্‌টা দেখছেন···তাঁরা শুধু দেখতে পাচ্ছেন··· কলম্বাসের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অপূর্ব্ব কৃতিত্ব আর বিশ্ব-জয়ী খ্যাতি ও সুনাম! এ ছাড়া মানব-চোখের আরো একটা দৃষ্টি আছে। সে দৃষ্টিতে যাঁরা চক্ষুষ্মান্,···তাঁরা দেখেন কোথায় গলদ, কোথায় ত্রুটী ও কোথায় কোন্ অপূর্ণতা জলজ্যান্ত হয়ে রয়েছে!

তাঁরা কলম্বাসের চরিত্র-সম্পর্কে গুটিকয়েক এমন কথা বলেছেন, যে সব কথার জবাব দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

তাঁরা বলেন, কলম্বাসের অদম্য উৎসাহ ছিল বটে কিন্তু সে উৎসাহের ভিত্তি ছিল কাল্পনিক—অনেকাংশে কবির কল্পনার মতই নিছক মিথ্যা ও অলীক!

চমৎকার তাঁদের যুক্তি! কলম্বাস উৎসাহী···সে

কথা তাঁরা অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তাঁর অপরাধ এই যে···বাস্তবের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু তাই কি সত্যি ?···বাস্তবের সঙ্গে তার কি কোন সম্পর্কই ছিল না ?

ভারতবর্ষের···তথা এসিয়ার এক সোনায় মোড়া দেশের তিনি রঙিন্ স্বপ্ন দেখে···উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন ! দুঃখ-দারিদ্র্য···বাধা-বিঘ্ন···বিপদের আশঙ্কা ও পরাজয়ের গ্লানি···কিছুই তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না,···য়ুরোপের দুয়ারে-দুয়ারে তিনি ভিক্ষা চেয়ে বেড়াতে লাগলেন শুধু তাঁর সেই রঙিন্ স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবার জন্য।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, সোনায় মোড়া দেশের··· গজমোতির পাহাড় বা হীরের ফুলের যে স্বপ্ন দেখে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, সে স্বপ্ন তাঁকে দেখালো কে ? সে কি নিছক ঘুমন্ত মানুষের স্বপ্ন বা কবির কল্পিত পক্ষিরাজ ঘোড়া ?

এর উত্তর হচ্ছে, না।···সে স্বপ্ন দেখবার আগে ভারতবর্ষের তথা এসিয়ার নাম কারো অজানা ছিল না··· অজানা ছিল শুধু তার পথ। সে অজানা পথের খোঁজ নেবার আগে···কতদিন যে তিনি তপোমগ্ন ঋষির মত সাধনায় কাটিয়েছেন···কত বিনিদ্র রজনী যে তিনি কেবল

মানচিত্র অঙ্কন আর মানচিত্র পর্য্যবেক্ষণ করে কাটিয়েছেন, —কে তার হিসাব রাখে ?

বাস্তব মানচিত্রে শতভাবে পরীক্ষার পর...তিনি সোনার দেশের রঙিন পথের যে আভাসকে সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলেন,...আজন্ম ভারতবর্ষ তথা এসিয়ার ধনৈশ্বর্য্যের কথা শুনে...যে সোনার দেশের উজ্জ্বল ছবি তিনি তাঁর বুকে এঁকে নিয়েছিলেন,—সে কি শুধু অলীক —নিছক মিথ্যা কল্পনা ? ভারত বা এসিয়ার বাণিজ্য ও পণ্যের খ্যাতি কখনো মিথ্যা ছিল না,...ভৌগোলিক মানচিত্র সে সময় অসম্পূর্ণ হলেও...চঞ্চল শিশুর হিজি-বিজি কালির আঁচড়মাত্র ছিল না। তাহলে...যে স্বপ্নের পেছনে ছিল কলম্বাসের উৎসাহ,...তাকে কখনো নিছক মিথ্যা বা অলীক বলা যায় না।

কলম্বাসের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ—তিনি নেতা হবার উপযুক্ত লোক ছিলেন না—নেতার পক্ষে যে সব গুণ থাকা দরকার, কলম্বাসের তা ছিল না।

এই সমালোচনা যাঁরা করেছেন...তাঁদের মনে রাখা উচিত,...কলম্বাস কখনো কোন নেতৃত্বের দাবি করেন নি। তিনি একজন আবিষ্কারক...অধ্যবসায়ী আবিষ্কারক। আবিষ্কারের নেশায় তিনি বেরিয়েছিলেন বিভিন্ন চরিত্রের

লোক নিয়ে ;···ন্যায়ের বিচারে সাজা পেয়ে যারা জেল-খানায় স্থান পেয়েছিল,···সেই সব জেলভাঙা কয়েদী পর্য্যন্ত ছিল তাঁর অনুচর।

একই ধর্ম্মের···একই মতের দশটি অনুচর থাকলে, তাদেরও বশে রাখা কত কঠিন! আর কলম্বাসের যারা অনুচর ছিল, তারা তো কত রকমের···কত পন্থার পথিক! কেবল তাইই নয়···তাদের অনেকেই ছিল সমাজের বিশিষ্ট মহাপুরুষ—জেলের কয়েদী! শৃঙ্খলা বা অনুবর্ত্তিতা তাদের কাছে আর কতটুকু আশা করা যেতে পারে? কাজেই তাদের চোখে মাঝে-মাঝে বিদ্রোহের ফুল্‌কি জ্বলে উঠেছে,···কলম্বাসকে ভূমিতলে অকৃতী নেতার আসনে বসিয়ে, তারা সমালোচকদের কাছে পঙ্কিল করে দেখিয়েছে। পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ নেতাকেও যদি একদল বিভিন্ন মতাবলম্বী কয়েদীর নেতৃত্বে বসানো হয়, তাহলে আমরা আশঙ্কা করি···তাঁর সেই নেতার গৌরবও অতি অল্পকালের ভিতরেই ধূলোয় মিলিয়ে যাবে!

কলম্বাসের বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ,···তিনি সৎ ও ধার্ম্মিক হলেও,···বড্ড কোপন-স্বভাব ছিলেন,···তারই ফলে দয়া ও উদারতার অভাব ছিল যথেষ্ট।

সমালোচকরা সম্ভবত বলতে চান···বিদ্রোহ দমনে

কলম্বাস নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন, পাদ্রী বয়েলকে পর্য্যন্ত মজুরের মত খাটিয়ে নিয়ে তিনি অনুদার স্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন,...তাঁর কোপন-স্বভাবের পরিচয়ও এতে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত...সে-যুগ আর এ-যুগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে অনেক।

কলম্বাস বেরিয়েছিলেন তাঁর সোনার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে...তাঁর দুঃখ-কষ্ট ও সাধনাকে সার্থক করে তুলতে। সেজন্য কোন দুঃখ-কষ্টকেই তিনি গ্রাহ্য করেন নি, কোন বিপদ্‌কেই তিনি বিপদ বলে গণ্য করেন নি। কিন্তু এতটা সত্ত্বেও...তবু যদি কেউ দাঁড়ায় তাঁর মুখোমুখি শত্রুর মত,...সে তাহলে কতটা দয়া আশা করতে পারে? সফলই যদি তারা হতে পারত...তাহলে কোথায় থাকত আজ কলম্বাসের খ্যাতি,...আর কোথায় থাকত রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড বা রাণী ইসাবেলার অনুগ্রহের মূল্য? হয়তো কলম্বাস নিষ্ঠুর ছিলেন...হয়তো ছিলেন তিনি অনুদার,...কিন্তু তাই বলেই তো এমন একটা কীর্ত্তি স্থাপন করতে তিনি পেরেছিলেন! নইলে সব-কিছুই যে আকাশ-কুসুমের উন্মাদ কল্পনা বলে আজও কুখ্যাত হয়ে থাকতো!

পাদ্রী বয়েলকে মজুর খাটিয়ে নেওয়ার কথাটাই

বড় হয়ে উঠেছে ! কিন্তু সে কি খুব একটা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত ব্যাপার···বিশেষতঃ দুর্দ্ধর্ষ পরিশ্রমী কলম্বাসের মত লোকের পক্ষে ? কলম্বাস নিজে তখন অভিযানের নায়ক···সকলের পুরোভাগে তাঁর স্থান। তা সত্ত্বেও··· তিনি কেবল হুকুমজারি করেই নায়কত্ব ফলানো অন্যায় মনে করেন,···দিনরাত পরিশ্রম করছেন উপনিবেশের উন্নতির জন্য। কিন্তু পাদ্রী বয়েল···কেবল তাঁর ধর্ম্ম-জীবনের ওজুহাতে কায়িক পরিশ্রম করতে নারাজ ; এমন একটা বিসদৃশ ব্যাপার,···ধর্ম্মের ছলে কর্ম্মে অবহেলা,··· অক্লান্ত কর্ম্মী কলম্বাসের পক্ষে ভালো লাগবে কেন ?— আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীতে কর্ম্মবীর বলে যাঁরা পরিচিত হয়েছেন, নিশ্চয়ই তাঁরা কেউ কলম্বাসের ব্যবহারে কোন ক্রুটী ধরবেন না।

যাঁরা একটু বেশী বুদ্ধিমান্, তাঁরা বলবেন···সময় ও লোক-বিশেষে···দু'রকম ব্যবহার করা আবশ্যক। পাদ্রাকে পর্য্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমে বাধ্য করে,···কলম্বাস তাঁর শত্রু-সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন মাত্র,···লাভ তাঁর কিছুই হয়নি।

তাঁদের সে কথা হয়তো অনেকাংশে সত্য। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, কলম্বাস নীতিবিদ্ ছিলেন না··· 'পলিটিক্স' বা 'ডিপ্লোমেসী' জিনিষটা তাঁর কাছে আশা

করা যায় না। যে জন্য তিনি বিখ্যাত, সেই কাজের যা উপকরণ,···সাহস, উৎসাহ, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়··· সে জিনিষ তাঁর কতখানি ছিল, কেবল সেটুকুই বিচার্য্য।

রঙিন স্বপ্নকে ফুটিয়ে তিনি বাস্তবে পরিণত করেছেন, তাই তিনি নমস্য। অজানার অন্ধকারে তিনি ভাস্বর সূর্য্যের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাই তিনি নমস্য। তরল মৃত্যুর অনন্ত সুনীল সীমানা পেরিয়ে তিনি ক্ষুদ্র পৃথিবীকে বিশাল করে গড়েছেন, তাই তিনি নমস্য।

কলম্বাস দেখিয়ে গিয়েছেন সমুদ্রজয়ের উৎকট আকাঙ্ক্ষা···কলম্বাস করে গিয়েছেন আবিষ্কারের উন্মত্ত ইঙ্গিত! মেরু-সমুদ্রে, প্রশান্ত-মহাসাগরে বা হিমালয়-অভিযানে···তারই উদ্যম···তারই অভিযান···তারই সাধনা আজও বিকশিত হচ্ছে···দিনের পর দিন···প্রতি বছরে!

—শেষ—